বিজ্ঞানের কিছু পুরানো প্রশ্নের নতুন বিবেচনা

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

স্বয়ম্বরার রঙিন পছন্দ

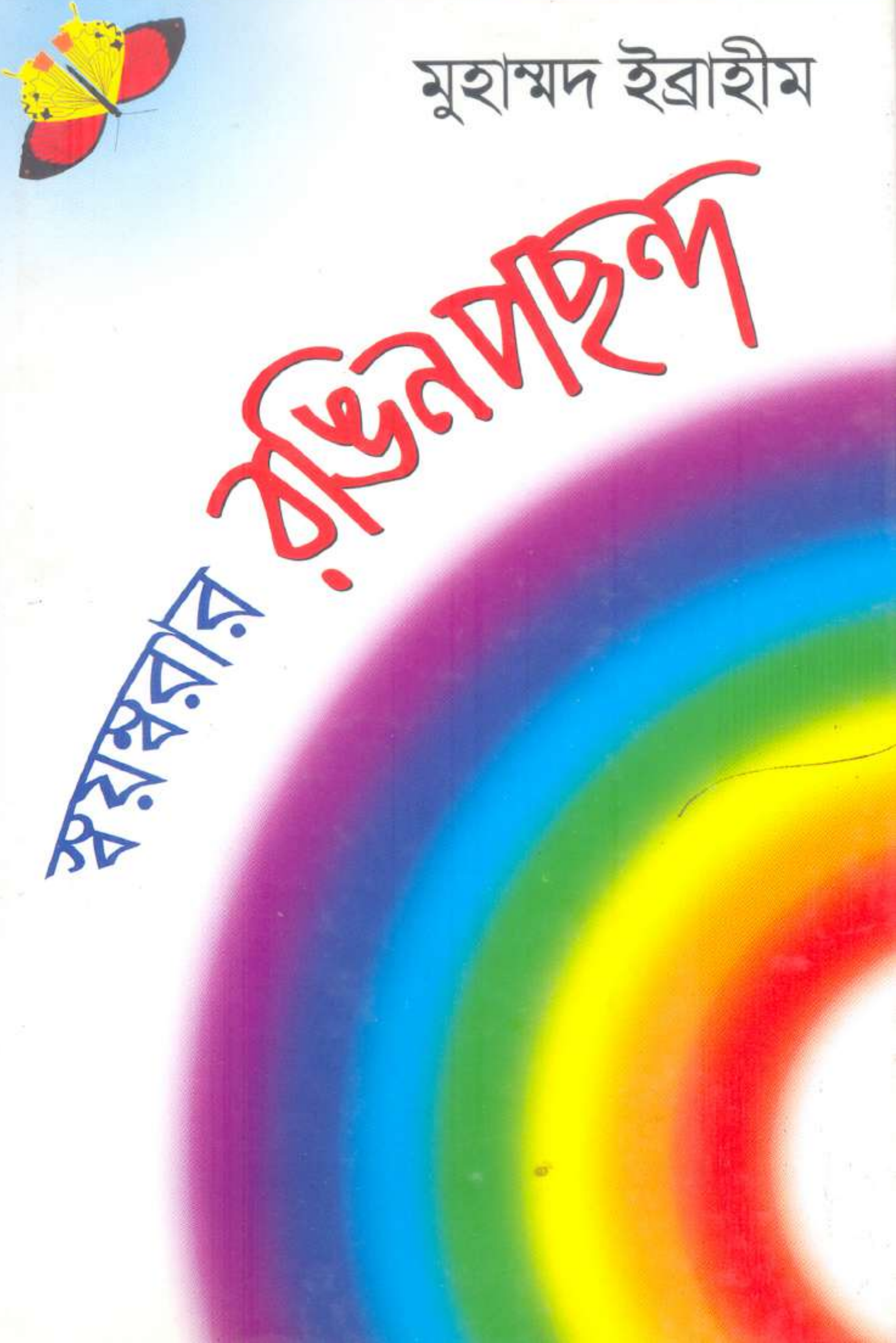

কী, কেন, কীভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান একটি অনন্য উপায়। যুগ যুগ ধরে পদে পদে তার সাফল্যের পরিচয় দিয়ে গেলেও বিজ্ঞানের কোন প্রশ্ন কোথাও একেবারে শেষ হয়ে যায়না। ঐ অনন্য পদ্ধতিতেই চলতে থাকে একই বিষয়ে আরো নূতন প্রশ্নের ধারা। নতুন চিন্তা, নূতন তথ্য এসে আরো সমৃদ্ধ করে বিষয়টিকে, খুঁজে পাওয়া যায় এগুবার নতুন পথ। বিজ্ঞান প্রশ্ন রাখেনা প্রকৃতি জগতের এমন বিষয় নেই– ছোট বড় সব কিছুতে তার প্রশ্ন বিস্তৃত এবং এসবের সব উত্তরের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সাযুজ্য থাকতে হয়। এটিই বিজ্ঞানের সৌন্দর্য ও সন্তুষ্টি। জগৎ-জীবনের ব্যাপক পরিসরে এমনিতরো নানা প্রশ্ন নিয়ে এই বই– 'স্বয়ম্বরার রঙিন পছন্দ'। এর নাম-প্রবন্ধের প্রশ্নটি হলো অনেক স্ত্রী-পাখি বর্ণাঢ্য পুরুষকে পছন্দ করে কেন? তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যুগে যুগে দেয়া হলেও এখন আরো নূতন তথ্য যোগ হচ্ছে তার সঙ্গে। এমনিভাবে এই বইতে অবতারণা করা হয়েছে আরো নানা বিষয়ে প্রশ্নের সাম্প্রতিক কিছু সংযোজন। তার কোন একটি আবার আমাদের জগৎ-চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি-ভূমিকে ছুঁয়ে যায়।

ISBN : 984 410 505 6

স্বয়ম্বরার রঙিন পছন্দ

স্বয়ম্বরার রঙিন পছন্দ

বিজ্ঞানের কিছু পুরানো প্রশ্নের নতুন বিবেচনা

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

স্বয়ম্বরার রঙীন পছন্দ ১১
মায়ের গর্ভে ভ্রূণের লড়াই ১৬
সংকর ও স্বাভাবিক ১৯
মোটা হবার ভাইরাস! ২৪
চায়ের কাপে তুফান ২৯
এই নদী, এই পানি ৩৪
মৌমাছির জগতে জন্মশাসন: আত্মীয়তার মাপজোক ৩৮
বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যা ৪৭
সেই বেড়াল কি বেঁচে আছে? ৫৬
প্রশ্নের শেষপ্রান্তে:স্ট্রিং থিওরি ৬৬
ডিএনএ কি বুদ্ধিমান? ৭১
গাছের অনুভূতি ৭৭
জেইন গুড-অলের অন্য সংসার ৮৩
বন্যকে গৃহপালনের ইতিকথা ৯৩
মানুষ কখন শস্য ভেঙ্গে রুটি বানালো ১০৭
জিএম খাদ্য সম্পর্কে ভিন্ন মত ১১২
আমাদের পরবর্তী সবুজ বিপ্লব ১১৭
গ্যালিলিওর মেয়ে ১২৩

স্বয়ম্বরার রঙিন পছন্দ

ভূমিকা

বিজ্ঞানে নূতন চিন্তার সুযোগ সব সময় অবারিত। প্রকৃতি জগতের একটি সাধারণ বিষয় হয়তো শত বছর আগে বিজ্ঞানীদেরকে ভাবিয়েছিল। হয়তো বা তারও আগে আরো কাউকে। এরপর থেকে তাঁদের চিন্তার আর গবেষণার ফসল হিসাবে আমরা কিছু ব্যাখ্যা এর জন্য দাঁড় করাতে পেরেছি। কিন্তু নূতন চিন্তা, নূতন তথ্য এসে সেই ব্যাখ্যাকে নাড়িয়ে দিতে পারে। এমনটি হরদম ঘটছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতে পূর্বসুরী ব্যাখ্যার সব কিছু যে ধ্বসে পড়ে তা কিন্তু মোটেই নয়। বরং এতে তাঁদের ধ্যান-ধারণাগুলো আরো পরিশীলিতও হতে পারে। নূতন ভাবে গবেষণা তাতে চমকপ্রদ সব নূতন মাত্রা এনে দিতে পারে যা বিজ্ঞান-চিন্তাকে আরো অনেক সন্তোষ-প্রদায়ী আর ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে। পাখিদের রাজ্যে স্ত্রী-পাখির দিক থেকে নিজে বাছাই করে যৌন-সঙ্গী নির্বাচন করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। যে সব বেশ-ভূষা বা আচরণ দেখে সে তা করে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন ডারউইনের সময় থেকে অনেক বিজ্ঞানী। বিবর্তনবাদের আলোকে ব্যাখ্যাগুলো ছিল চমৎকার। কিন্তু 'স্বয়ম্বরার রঙিন পছন্দ' নিয়ে এখন জীব-বিজ্ঞানীরা আরো চমৎকার নূতন চিন্তা যোগ করছেন। সে সব নিয়েই এই বইয়ের নাম-প্রবন্ধ।

আরো কিছু প্রবন্ধে জীবজগতের বিষয়ে, এবং ঘনিষ্ঠতরভাবে মানুষের নিজের বিষয়ে, কিছু নূতন ক্ষেত্রের গবেষণার অবতারণা রয়েছে। এর সবকিছুই যে জগৎ-জীবনের একেবারে মৌলিক কিছু তাও নয়। 'চায়ের কাপে তুফান'ও রয়েছে এর মধ্যে। কিন্তু তবুও সবগুলো মিলে বিজ্ঞানীরা এখন কত শত বিষয়ের ভাবনায় ব্যস্ত তার খানিকটা পরিচয় এতে পাওয়া যেতে পারে। কিছু কিছু বিষয় যথেষ্ট মৌলিক প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে, বলতে গেলে আমাদের বিশ্ব-চেতনার রীতিমত দার্শনিক

ভিত্তি-ভূমিকে নিয়ে যার কারবার। 'ডিএনএ কি বুদ্ধিমান' প্রবন্ধটিতে যে প্রশ্ন উত্থাপিত তা এমনি কিছুকে ছুঁয়ে যায়। যে শতাব্দীটি আমরা ছেড়ে এসেছি নানা দিক থেকে সেটি ছিল মূলতঃ পদার্থবিদ্যার শতাব্দী। 'বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার' একটি খুব খুব সাদামাটা খতিয়ান নিয়ে তার অমীমাংসিত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে– 'সেই বেড়াল কি বেঁচে আছে', কিংবা 'প্রশ্নের শেষ প্রান্তঃ ষ্ট্রিং থিওরির' প্রসঙ্গে। বলা বাহুল্য বেড়ালটি হলো শ্রোডিঙ্গারের উভয়-সংকটের সেই বেড়াল যেটি বেঁচে আছে কি মরে গেছে এই সিদ্ধান্ত কোয়ান্টাম মেকানিক্স দিতে চায়না, আর তার ফলে এই শক্তিশালী তত্ত্বটি দার্শনিকভাবে সবাইকে অতৃপ্ত রাখছে। আরো কিছু প্রশ্ন কয়েকটি প্রবন্ধে আনা হয়েছে যেগুলো বিজ্ঞানী নয় এমন মানুষকেও ঘনিষ্ঠভাবে ভাবিয়ে থাকে। 'গাছের অনুভূতি' নিয়ে জগদীশ বসু প্রশ্ন তুলেছিলেন, এখনো প্রশ্ন উঠছে। বন্য প্রাণির বন্ধু 'জেইন গুড-অলের অন্য সংসার'– তাঁর শিম্পাঞ্জী বন্ধুদের নিয়ে। 'মানুষ কখন শস্য ভেঙ্গে রুটি বানালো' কিংবা 'আমাদের পরবর্তী সবুজ বিপ্লব'–এগুলো যথাক্রমে অতীত আর ভবিষ্যৎকে নিয়ে হলেও আজকের বিজ্ঞানই এ নিয়ে কাজ করছে। বিজ্ঞানের এসব বিচিত্র প্রশ্ন শুধু আমাদের জীবন-জীবিকাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে বলেই নয়, বিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনায় চমকপ্রদভাবে সমৃদ্ধ বলেও আমাদের কাছে প্রিয় হতে পারে।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারী ২০০৬

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

স্বয়ম্বরার রঙীন পছন্দ

জীবজগতে কোন কোন জীবের ক্ষেত্রে স্ত্রীরা বর পায় নিজে নিশ্চেষ্ট থেকে আগ্রহী বরেরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ঠিক করে উপযুক্ত পাত্রটি কে? শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত শিং নিয়ে পুরুষ হরিণ যখন প্রাণপণে অন্য পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে– তার উদ্দেশ্য একটাই। অন্যদেরকে যুদ্ধে হারিয়ে, তাড়িয়ে দিয়ে, সে যত বেশি সম্ভব স্ত্রী হরিণের বরমাল্য পাবে– গড়ে তুলবে বড় সড় একটি হেরেম।

কিন্তু জীবের আর একটি বড় গোষ্ঠি রয়েছে যেখানে স্ত্রীরা হয় স্বয়ম্বরা– নিজেরাই বর পছন্দ করে নেয়। পক্ষী জগতের প্রায় সবই এই দলে পড়ে, তাছাড়া অন্যরাও রয়েছে যার মধ্যে সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীরাও আছে। গত এক শত বছরের গবেষণা

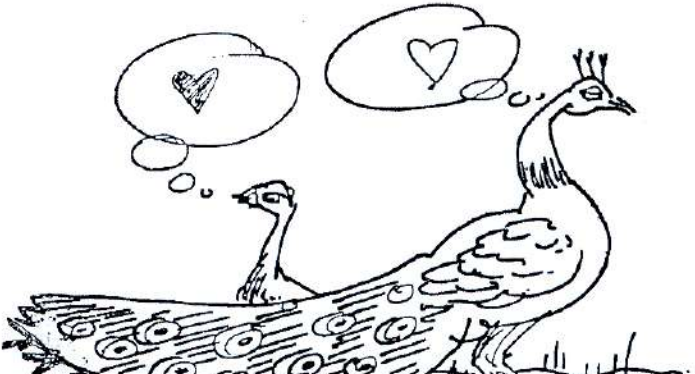

জীব-আচরণের এই দিকগুলোর সম্পর্কে অনেক কিছু উদ্ঘাটিত হয়েছে। একটি বিষয় সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তা হলো এ রকম স্বয়ম্বরা স্ত্রী জীবের পছন্দ সব সময় উজ্জ্বল, কড়া রঙে রঙীন পুরুষদের দিকেই যায়। আর পুরুষরাও এ জন্য অমনি রঙীন সাজে সাজতে, রঙের বাহার দেখিয়ে নাচতে কার্পণ্য করেনা– সেই ক্ষেত্রেই যেন চলে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। একি নেহাতই স্ত্রী জাতির সৌন্দর্য-প্রীতি, না কি আরো কিছু আছে। কেন তারা শেষ অবধি সব চেয়ে বর্ণাঢ্য পুরুষটার গলায় বরমাল্য দেয়?

স্বয়ম্বরাদের এই পছন্দ-অপছন্দ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ডারউইনের সেই বিখ্যাত ব্যাখ্যার অতিরিক্ত তেমন কিছু বলতে পারেননি। তা হলো যে সব পুরুষ নিজের সাজসজ্জার উন্নয়নের জন্য তার শক্তি ও সম্পদ বিনিয়োগ করতে পেরেছে, তারা নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত অধিক সমৃদ্ধ, কাজেই ভবিষ্যত সন্তানের মধ্যে একই রকম উপযুক্ততা সৃষ্টি করতে এমন পিতাই প্রয়োজন।

অবশ্য কম উপযুক্তরাও যে ওরকম রঙীন সাজ বা অন্য রকম কিছু জাঁকজমক করতে না পারে তা নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের অন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধ সাধবে, এবং ওভাবে তারা টিকতে পারবেনা। এই উপযুক্ততা কথাটির অর্থ নিয়েও বিজ্ঞানীরা বেশ ভেবেছেন। এখন যে তত্ত্বটা এ সম্পর্কে গুরুত্ব পাচ্ছে তা হলো উপযুক্ততার মধ্যে সব চেয়ে বেশি বিবেচ্য হলো রোগের হাত থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা। সাধারণ বিবেচনায় তত্ত্বটি বিশ্বাস-যোগ্য বলে মনে হয়। যেমন রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবীকে দমন করার জিন যার মধ্যে বেশি সক্রিয়, সাজসজ্জার দিকে সেই বেশি মনোযোগী হতে পারবে। হাজার হোক দুর্বল, জীবাণু-ক্লিষ্ট পুরুষ তো দেখতে ম্রিয়মানই হবে, রঙীন জৌলুষ তার আসবে কোত্থেকে। কিন্তু তত্ত্বটি প্রমাণ করতে হলে শুধু এরকম যুক্তিই যথেষ্ট নয়। আরো প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এর জন্য প্রয়োজন। কিন্তু সেটি সহজ নয়।

উজ্জ্বল বর্ণ ধারণের সঙ্গে রোগের বিরুদ্ধে অধিক ক্ষমতার একটি সম্পর্ক দেখাবার যে সব চেষ্টা চলেছে তার সবগুলো সফল হয়নি। সম্প্রতি এ রকম ৫০টি পরীক্ষার ফলাফলকে সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে একত্রে মিলিয়ে দেখা গেছে যে পরজীবি প্রাদুর্ভাবের সংগে রঙের জৌলুষের বাড়া-কমার কোন স্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায় না। তবে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার সংগে রঙীন হবার একটি সম্পর্ক দেখা যায়। কিন্তু সেটি কেন হবে, তার হদিশ সহজে মেলেনি।

এজন্য তাকাতে হয়েছে জীব দেহে বাহারি রঙ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী রঙ-বস্তুগুলোর দিকে। দেখা গেছে ক্যারোটেনোয়েড নামক এক রকম প্রাকৃতিক রঙবস্তুর বড় ভূমিকা রয়েছে এতে। পুরুষ প্রাণিগুলো স্ত্রীকে দেখাবার জন্য যে সব রঙের ছটা ধারণ করে সেগুলোর অধিকাংশ ক্যারোটেনোয়েডে গড়া। সাধারণত উদ্ভিদের মধ্যে এটি সৃষ্টি হয় - যা পরে খাদ্যের মাধ্যমে প্রাণির দেহে যায়। ক্যারাটেনোয়েডগুলো হয় লাল, কমলা, হলুদ অথবা গোলাপী। তবে প্রোটিনের সংগে যুক্ত হয়ে নীল আর সুবজ রঙও এটি দিতে পারে। দেহের বিভিন্ন ধরনের কোষকলার মধ্যে ক্যারোটেনোয়েড জমিয়ে পুরুষ প্রাণিরা রীতিমত বর্ণাঢ্য সজ্জা নিতে পারে।

রঙীন পাখি রঙীন মাছ– এই ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে স্ত্রী-জাতির পছন্দ সব চেয়ে বর্ণাঢ্য পুরুষটিকে। তবে উপযুক্ততার তত্ত্বটি মানতে হলে ও রকম বর্ণাঢ্যতা প্রমাণ করবে ওরকম মূল্য দেবার ক্ষমতা রয়েছে কোন পুরুষের। সম্প্রতি ওয়েন আর ওলসন এ দু'জন বিজ্ঞানী একটি চমৎকার তত্ত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন বর্ণাঢ্য হতে গিয়ে যে মূল্য দিতে হয় তা তিন রকমের হতে পারে– ঝুঁকি নেয়া, বিরল হওয়া অথবা প্রয়োজনীয় হওয়া। এই তিনটির একটি তাকে হতেই হবে।

ঝুঁকির ব্যাপারটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। ক্যারোটেনয়েড থাকার জন্য স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোন ঝুঁকি প্রাণিকে নিতে হয় এমন কিছু দেখা যায়নি। যদিও চিকিৎসাবিদ্যায় বাড়তি ক্যারেটেনোয়েড শরীরে নেবার সঙ্গে ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধির দুই একটি কেইস দেখা গেছে– রঙিন প্রাণির জগতে তেমন কিছু দেখা যায়নি। তা হলে নজর দিতে হয় বিরল হওয়া আর প্রয়োজনীয় হওয়ার দিকে।

ক্যারোটেনোয়েড থাকা এবং তার জন্য বর্ণাঢ্য হওয়ার ব্যাপারটি আসলেও খুব যত্রতত্র ঘটার ব্যাপার নয়। শুধু যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান পুরুষের ক্ষেত্রেই এটি পূর্ণরূপ লাভ করে। কিন্তু শুধু বিরল হওয়ার মধ্যে রঙীন হবার পুরো মূল্য দেয়াটি বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে তৃতীয় সম্ভাবনাটার দিকেই পাল্লা ভারী। বহু দিক থেকে প্রমাণ মিলছে যে ক্যারোটেনোয়েড একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। এই প্রয়োজনীয় বস্তুটিতে সমৃদ্ধ হতে হলে মূল্য দিতে হয়। উপযুক্ত হতে হয়।

ক্যারোটেনোয়েডকে বিশেষ ভাবে দরকার হচ্ছে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের কাজে। আর দরকার যে সব ফ্রি র‍্যাডিকাল শরীরকে বুড়িয়ে ফেলে বিষক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অকার্যকর করে দেবার কাজে। বিভিন্ন প্রাণির মধ্যে ক্যারোটেনোয়েডের এই ভূমিকা দেখা শেষে। ইঁদুরের উপর এটি প্রয়োগ করে দেখা গেছে– এটি টি আর বি লিম্ফোসাইট নামক উপাদান সৃষ্টি করেছে যা রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু দমন করে। তা ছাড়া আঘাত পেলে তার প্রদাহ নিবারণের জন্য যে সাইটোকিন ও ইন্টানিউকিন প্রয়োজন হয়, ক্যারোটেনোয়েড তারও সৃষ্টি করে।

এইটুকু স্পষ্ট যে ক্যারোটেনোয়েড জরুরী জিনিস, মূল্যবান জিনিস। প্রাণি এই মূল্যবান জিনিস স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহার করতে পারে, আবার রঙের জৌলুসে ভাসতেও ব্যবহার করতে পারে। যে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইতোমধ্যেই আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত, সেই পারে বর্ণাঢ্য হবার মত বিলাসিতা করতে। কাজেই বর্ণাঢ্য হবার মধ্যে রয়েছে সুস্বাস্থ্যের প্রমাণ, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রমাণ। এই বিষয়টি আবিষ্কৃত হবার আগে স্বয়ম্বরা যে কেন বর্ণাঢ্যতা পছন্দ করে তার বৈজ্ঞানিক কারণটি স্পষ্ট হচ্ছিলনা। এর সনাতন ব্যাখ্যাটি সঠিক, কিন্তু সেটি যথেষ্ট ছিলনা।

বর্তমান তত্ত্বটির একটি চমৎকার প্রমাণ মিলেছে ১৯৮৬ সনের চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর ঐ অঞ্চলের সোয়ালো পাখির উপর গবেষণায়। ঐ পাখির রক্ত পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে তেজষ্ক্রিয়তার ফলে তাদের রোগ প্রতিরোধ– ক্ষমতার উপর চাপ পড়েছে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারছেনা। পুরুষ পাখিগুলোর লম্বা লেজ ঠিকই আছে, কিন্তু তার বড় প্রায় সবগুলোর ক্ষেত্রেই এখন ফ্যাকাশে– সাধারণত যেরকম বর্ণাঢ্য থাকে সে রকম নয়। স্পষ্টতঃ প্রয়োজনীয় ক্যারেটেনোয়েড এখন ব্যতিক্রমী রকমের ফ্রি র‍্যাডিকালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কাজে লেগে যাচ্ছে। এটি রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতায় যেতে পারছেনা, আর বাহারি রঙে সাজার কাজেও যেতে পারছেনা। এখানকার স্ত্রী পাখিরাও তাই খুব বাহারি পুরুষ এখন আর খুঁজছেনা। মন্দের ভাল যারা আছে তাদের নিয়েই খুশি থাকছে।

উজ্জ্বল রক্তিম রঙের সংগে সু-স্বাস্থ্যের সম্পর্ক যে শুধু সঙ্গী-নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় তা নয়। অদ্ভুত সব ক্ষেত্রেও এখন এর ভিত্তিতে নূতন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চমকপ্রদ কিছু গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে পাখির মা যখন বাচ্চাদের জন্য মুখে করে খাবার নিয়ে আসে এবং প্রত্যেকটি বাচ্চা তখন বিকট রকমের হা করে ঐ খাবার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, পাখি তখন সব চেয়ে বড় হা করা বাচ্চাকেই খাবার আগে দেয়। এখন বোঝা গেছে যে ঐ হা করাটা শুধু বাচ্চার ক্ষুধা প্রকাশ করা নয়, বরং মাকে দেখানো যে তার টকটকে লাল মুখ কত

বেশি লাল– যার মানে সে কত সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে বিবর্তনের ফলে পাখির মা তার সীমিত ক্ষমতায়, সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী বাচ্চাগুলোকেই বাঁচিয়ে রাখতে চায়, দুর্বলগুলোকে নয়। কাজেই বাচ্চারা সবাই নিজকে সবল বলে জাহির করতে চায়– রঙ দেখিয়ে। কৃত্রিম ভাবে কিছু বাচ্চাকে বাড়তি ক্যারোটেনোয়েডে দিয়ে দেখা গেছে যে তাদের হা করা মুখ আরো টকটকে লাল হয়ে উঠছে এবং তারা মায়ের মনোযোগ পাচ্ছে আরো বেশি।

পাখির ডিমের কুসুম যে রঙিন হয়– হলুদ বা লাল-তারও কারণ কিন্তু ক্যারোটেনোয়েড। কুসুম হলো ডিমের ভ্রূণ– দ্রুত বর্ধনশীল জীবনের আধার। এর এই দ্রুত জৈবিক পরিবর্তনের কারণে এখানে প্রচুর ফ্রি র‍্যাডিকালের সৃষ্টি হয় যেটি ভ্রূণের জন্য বিপজ্জনক। ক্যারোটেনোয়েড ভ্রূণকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই পাখির ডিমের কুসুমকে ক্যারোটেনোয়েড সমৃদ্ধ খাবার খাইয়ে ডিমের কুসুমকে আরো রঙিন করে তোলা সম্ভব হয়েছে এ ধরনের গবেষণায়।

মায়ের গর্ভে ভ্রূণের লড়াই

মায়ের গর্ভে বাচ্চার ভ্রূণ যখন ছোট্ট জীবনের রূপে সযত্নে থাকে বলে আমরা মনে করছি, তখন কিন্তু এটি মোটেই সকল রকম জীবাণুমুক্ত নিরাপদ অবস্থায় থাকে না মোটেই। সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে ভ্রূণ এবং বর্ধিষ্ণু সন্তানের চারদিক ঘিরে থাকে বেশ ভয়ঙ্কর রকমের নানা ভাইরাস– কোনো-কোনটি এইডস ভাইরাসেরই সমগোত্রীয়। সন্তান মায়ের জরায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে যে প্ল্যাজেণ্টার

মাধ্যমে তার অবস্থা আরো জটিল– সেখানে ভাইরাসের আধিক্য আরো বেশি। এত ভাইরাসের মধ্যে থেকে মানবভ্রূণের মতো একটি অসহায় জীব কী করে আক্রান্ত হওয়া থেকে বেঁচে ভূমিষ্ঠ মানবশিশুতে পরিণত হয় সেটি একটি ভাববার বিষয় বৈকি। কিন্তু আসলে ভ্রূণতত্ত্ববিদ মাত্রই জানেন যে, এই ভাইরাসগুলো ভ্রূণকে আক্রান্ত করার জন্যই নয়, বরং গর্ভধারণের আনুসঙ্গিক প্রয়োজনেই সেখানে বাস করছে।

এ ধরনের ভাইরাসগুলোকে সাধারণভাবে বলা হয় এন্ডোজেনাস রেট্রোভাইরাস বা সংক্ষেপে ইআরভি। এখন মনে করা হচ্ছে যে, এগুলো বিপজ্জনক তো নয়ই বরং এদের সহায়তা ছাড়া সন্তান মায়ের গর্ভে নিরাপদে থাকতেই পারত না।

জীবকূলে স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তনের পরেই মা তার দেহের ভেতরেই একটি পূর্ণাঙ্গ সন্তানকে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে পেরেছে। অন্য সবাই ডিমের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে– সন্তান বেড়ে ওঠে বাইরে, ডিমের ভেতর। নিজের দেহের মধ্যে সন্তানকে পূর্ণাঙ্গ করতে পারার সুবিধা অনেক। এর ফলেই স্তন্যপায়ীরা সহজে অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে– দুনিয়ার এমন কোনো জায়গা বা পরিস্থিতি নেই যেখানে তারা বিস্তার লাভ করেনি। ডাইনোসরদের বিলুপ্তির পর দুটি কারণে স্তন্যপায়ীরা তাদের জায়গা দখল করে আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছিল। তার একটি হল নিজের দেহের মধ্যেই সন্তানকে ধারণের ও লালনের সুযোগ। আর অন্যটি হল উষ্ণ রক্তের মাধ্যমে দেহের পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা। ডিমের বদলে দেহে সন্তানধারণের বড় সুবিধা হল বড় আকারের মস্তিষ্ককে গড়ে উঠতে দেবার জন্য যে প্রচুর অক্সিজেন আর পুষ্টির দরকার হয়, তা মায়ের দেহ থেকে সরাসরি সংগ্রহ করতে পারা।

আপাতদৃষ্টিতে মায়ের দেহে এভাবে সন্তানকে বাড়িয়ে তোলাটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এতে বড় রকমের কয়েকটি সমস্যা হতে পারত। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বিজাতীয় হয়েও সন্তানের পক্ষে মায়ের দেহের সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকতে পারা। বিজাতীয় এই জন্য যে জ্রূণের অর্ধেক জিনই তো মায়ের থেকে পাওয়া নয়, সেটি সম্পূর্ণ আর একজন ব্যক্তি বাবার থেকে পাওয়া। আমাদের দেহের যে-প্রতিরক্ষাব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) রয়েছে তাতে নিজদেহের বাইরের যে-কোনো জৈব সংস্থাপনাকে এটি ভয়ানকভাবে বাধা দিতে চাইবে। জ্রূণ যেহেতু বিজাতীয় মায়ের দেহ সেটিকে অগ্রাহ্য করে ধ্বংস করে ফেলারই কথা ছিল, অথচ কার্যত হয় তার বিপরীত।

আরো জটিলতা সৃষ্টির কারণ ঘটতে পারত মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণের অবস্থানের প্রকৃতি থেকে। সন্তানের জ্রূণ ও প্ল্যাজেন্টা মায়ের জরায়ুতে এমনভাবে জেঁকে বসে

যেটা একভাবে দেখতে গেলে অনেকটা টিউমারের মতো। টিউমারের মতোই প্ল্যাজেন্টা জরায়ুর দেয়ালে রীতিমতো অভিযান চালায়, এর থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে, এমনকি জেনেটিক দিক থেকে বিজাতীয় জীবকোষ মায়ের শরীরের নানা অংশে পাঠিয়ে দেয়। এতটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আসা সত্ত্বেও মায়ের দেহে ভ্রূণ দিব্যি শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারে।

এটি গেল একটি দিক। মায়ের জরায়ুতে জেঁকে বসে ভ্রূণ মায়ের রক্ত ও পুষ্টিতে ভাগ বসাচ্ছে বটে, কিন্তু এটি মায়ের দেহের সকল ক্ষতিকারী জীবাণুর দায়ভাগ নিতে নারাজ। মা এসব ক্ষতিকারকের প্রভাব সহ্য করতে পারলেও নাজুক ভ্রূণের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব। নিদেন পক্ষে ওগুলো বর্ধিষ্ণু ভ্রূণের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করবে। এ এক উভয়-সংকট। মায়ের দেহের ইমিউন-ব্যবস্থা ও ক্ষতিকারক জীবাণুর থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভ্রূণের প্রয়োজন নিজের চারদিকে একটি প্রতিরক্ষাদেয়াল গড়ে তোলা, যা যত দুর্ভেদ্য হবে তত ভালো। অথচ পুষ্টি ও অক্সিজেন পাওয়ার জন্য এবং নিজের বর্জ্য পদার্থগুলো নিষ্কাশনের জন্য মায়ের দেহের সঙ্গে অতি অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক রাখাটাও তার জন্য জরুরি। এখন মনে করা হচ্ছে যে, এই উভয় সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্যই রয়েছে ভ্রূণের ও প্ল্যাজেন্টার সঙ্গে অসংখ্য ভাইরাস- ইআরভিগুলো।

ইআরভি একভাবে ভ্রূণ আর মায়ের দেহের মধ্যে এক ধরনের ব্যবধান রচনা করে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে হানি না করেই। মায়ের দেহের ক্ষতিকর জীবাণু যখন প্ল্যাজেন্টাকে আক্রমণ করে তখন প্ল্যাজেন্টার দেয়ালে কোষের বাইরে যেসব গ্রহণকারী ব্যবস্থা জীবাণুকে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয়, সেগুলো আগে থেকেই ইআরভি দখল করে রাখে। এই প্রতিযোগিতায় পড়ে ক্ষতিকারক জীবাণু প্ল্যাজেন্টার কোষে ঢুকতেই ব্যর্থ হয়। ইমিউন সিস্টেমের বিরুদ্ধে ভ্রূণকে রক্ষা করার বিষয়টিও নানাভাবে ঘটতে পারে। যেমন ভ্রূণ এমন কিছু প্রোটিন তৈরি করতে পারে যা মায়ের কিছু ইমিউন কোষকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারে। এর মধ্যে ইআরভিরও একটি অবদান রয়েছে যদিও ইমিউন সিস্টেম থেকে রক্ষার জন্য এটি অত্যাবশ্যকীয় কি না তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে একটি জিনিস স্পষ্ট তা হল আপাত ক্ষতিকর এইসব ভাইরাস মানবভ্রূণের জন্য বরং একটি নিরাপত্তাবেষ্টনী তৈরিতেই সাহায্য করছে।

সংকর ও স্বাভাবিক

সংকর প্রাণী নিয়ে গবেষণার একটি উর্বর ক্ষেত্র হল প্রজাপতির জগৎ। প্রজাপতির প্রত্যেক প্রজাতির জন্য গায়ের বিচিত্র প্যাটার্ন মোটামুটি একক প্রকৃতির হয়। এদের একটির থেকে অন্য প্রজাতির প্যাটার্ন সাধারণত বেশ নাটকীয়ভাবেই ভিন্ন থাকে। ফলে এখানে প্রজাতির পরিচয় যেন তার ডানায় পতাকার মতো মেলে ধরা থাকে। কাজেই দুটি প্রজাতি যদি পরস্পরের সঙ্গে যৌন মিলনে সংকর জাত গঠন করে তাও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ডানার উপর খচিত প্যাটার্ন থেকেই। ল্যাটিন আমেরিকার জঙ্গলে অসংখ্য প্রজাপতির উপর গবেষণা করে কিছু বিজ্ঞানী সংকর প্রাণী সম্পর্কে আমাদের অনেক প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বদলে দেবার উপক্রম করেছেন।

দেখা গেছে যে, হেলিও কোনিয়াম গোত্রের প্রজাপতিদের যত প্রজাতি তার প্রায় এক চতুর্থাংশ অহরহ সংকর জাত গঠন করছে। এটি আমাদের প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী, কারণ মনে করা হয় যে, সংকর প্রজনন একটি অতিবিরল ও ব্যতিক্রমী ঘটনা; প্রজাতিমাত্রই শুধু নিজেদের মধ্যে যৌন মিলন সীমাবদ্ধ রাখে। আসলে আমরা প্রজাতির সংজ্ঞাই স্থির করে আসছি এই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে– প্রাণিকুলের যেসব সদস্য নিজেদের জেনেটিক গুণাগুণগুলো মিশ্রণ শুধু নিজেদের দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, দলের সব সদস্যকে তখন আমরা একই প্রজাতি বলে অভিহিত করেছি।

আসলে ব্যাপক হারে সংকরায়িত হবার প্রবণতা শুধু প্রজাপতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বেশ কিছু পাখির ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে– হাঁস, শিকারযোগ্য পাখি ইত্যাদি জাতীয় কিছু পাখি। প্রবালদ্বীপের মধ্যে যেসব মাছের বাস তাদের বিশ শতাংশ

অহরহ সংকর সৃষ্টির ফলে। স্তন্যপায়ীর মতো উন্নততর প্রজাতিতে এসেও এ প্রবণতা লোপ পায় নি। নীল- তিমিকে ফিন-তিমির সঙ্গে সংকরায়ন করতে প্রায়শই দেখা যায়। মোটের উপর বলা যায় যে, প্রাণিজগতে দশ শতাংশ এবং

উদ্ভিদজগতের বিশ শতাংশ প্রজাতি জিন-মিশ্রণের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রজাতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। একটি লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হল– যেসব প্রজাতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিবর্তিত হচ্ছে তাদের মধ্যেই সংকরায়িত হবার প্রবণতা বেশি।

আসলে প্রজাতিকে খুব বাঁধা-ধরা গণ্ডির মধ্যে রাখার বিষয়ে জীবতত্ত্ববিদদের চেষ্টাটি খুব পুরানো নয়। উনিশ শ' তিরিশের দশক থেকেই এটি জোরদার হয়েছে প্রধানত বিবর্তন-বিজ্ঞানী মায়ার আর দুভজানস্কির প্রভাবের ফলে। এই চিন্তাধারার ফলেই আমরা সংকর শব্দটিকে একটি ত্রুটি বা বৈকল্যের সমার্থক বলে ধরে নিতে শিখেছি– যেন তারা প্রকৃতির নিয়মকেই অগ্রাহ্য করছে। সংকরের প্রতি এই বিরূপ ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সেই থেকে আজ অবধি চলে আসছে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৩ সালের বিপন্ন প্রাণী রক্ষার্থে একটি আইনকে ১৯৭৭ সালে সংশোধন করে তা থেকে সংকর প্রাণীগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে।

পাখি আর প্রজাপতি সন্ধানীদের জন্য সুন্দর-সুন্দর গাইড বই রয়েছে। তাতে সংকরদের উল্লেখ কদাচিৎ দেখা যায়, কোনো ছবি দেয়া দূরে থাক।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এই বৈষম্য এখনো বজায় রাখার কোনো যুক্তি নেই– সংকর নমুনাগুলোকে জীববৈচিত্র্যের সাধারণ ছবির মধ্যে সমান গুরুত্ব দিয়েই আনা উচিত। এর মানে এই নয় যে, প্রাণীর প্রজাতি, গণ, পরিবার ইত্যাদি কথার আর কোনো মানে থাকবে না, তবে এই ধারণাগুলোকে এখন আর বাস্তব চিত্রকে ঘোলাটে করার সুযোগ দেয়া হবে না, যা আমাদের প্রকৃত উপলব্ধির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। আসলে বিবর্তনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের যে ভূমিকা তা কাজ করে এক-একটি প্রাণীর ক্ষেত্রে বা এক-একটি জিনের ক্ষেত্রে– প্রজাতির ক্ষেত্রে নয়। হ্যাঁ কোনো-কোনো সংকরের বংশবৃদ্ধির অক্ষমতার মতো জেনেটিক অক্ষমতা থাকে বটে কিন্তু বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তারাও অন্যদের মতো ঠিকই অংশ গ্রহণ করছে। এখানেও যে খাপ খাওয়াতে পারে সে-ই টিকে থাকে– সে প্রজাতি-সীমানার ভেতরে রইল কী বাইরে রইল সেই প্রশ্ন ওঠে না ।

প্রজাতির সীমার বাইরে জিনের অনুপ্রবেশের এই প্রক্রিয়া অবশ্য প্রজাতিগুলোর পৃথক সত্তা বজায় রাখার অন্তরায় হচ্ছে না– কারণ প্রাকৃতিক নির্বাচন সে ব্যবস্থা করে রাখছে। সংকর বাবা-মায়ের ক্ষেত্রে ভ্রূণের বিনষ্টির সম্ভাবনা বেশি। তা ছাড়া সংকররা সাধারণত বন্ধ্যাও হয়। কিন্তু সব সময় কারণটা এরকম অক্ষমতাজনিত নয়। আরো সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় প্রজাতি-সীমানার বিষয়টি বজায় থেকে যায়। যেমন প্রজাপতির দুটি কাছাকাছি প্রজাতি ইকুয়েডরে আন্ডিজ পর্বতাঞ্চলে পাশাপাশি অঞ্চলে বাস করে। শুধু ৫ কিলোমিটার চওড়া একটি সরু ফালিমতো জায়গায় ওরা উভয়েই বাস করে– অন্যত্র যার-যার এলাকা আলাদা। ঐ ফালির মধ্যে উভয়ের সংকরায়নের ফলে প্রায় ১০ শতাংশ প্রজাপতি এদের সংকর হিসাবে রয়েছে। এই সংকরদের কোনোরকম অক্ষমতা নেই– মূল প্রজাতি দুটোর মতোই এরা স্বাস্থ্যবান– তাদের ডিমের সংখ্যা, লার্ভার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা, বৃদ্ধির গতি ইত্যাদি সবই স্বাভাবিক পর্যায়ের। তাহলে এখানে প্রজাতির স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকছে কীভাবে? থাকছে, কারণ তারপরেও প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করে যায় প্রজাতি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সপক্ষে।

ঐ প্রজাপতি দুটোর যারা শত্রু তারা কিন্তু ডানার বিশিষ্ট প্যাটার্ন দেখেই এদেরকে চেনে। অভিজ্ঞতায় তারা দেখেছে এদের শরীরে বিষাক্ত পদার্থ আত্মরক্ষার্থে রয়েছে, কাজেই শিকার করে এদের খেলে এ বিষক্রিয়ায় ভুগতে হয়। এভাবে ডানার প্যাটার্ন এদের ক্ষেত্রে শত্রুদের দূরে থাকার জন্য সাবধান করে দিচ্ছে।

সংকর সদস্যদের ক্ষেত্রে এই প্যাটার্ন কিন্তু বজায় থাকছে না– দুইয়ের মিশ্রণে নতুন এক ধরনের প্যাটার্ন পাচ্ছে যা শত্রুরা চেনে না। ফলে তারাই আক্রান্ত হয়ে মারা পড়ে বেশি– তাদের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ হয়ে যায় বিশুদ্ধ প্রজাতি দুটোর তুলনায়।

অবশ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলে গেলে অনেক সময় অতীতে যা সংকরের বিপক্ষে ছিল, তা-ই আবার সংকরের সপক্ষে চলে আসতে পারে। ডারউইন-খ্যাত সেই গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে এমনটির উদাহরণ রয়েছে। এখানে বিশেষরকমের চড়ুইদের সংকর যথেষ্ট দেখা যায়। এই সংকরগুলো বিশুদ্ধ প্রজাতির মতোই স্বাস্থ্যবান ও উর্বর– কিন্তু লম্বা ও বেঁটে ঠোঁটওয়ালা চড়ুইয়ের সংকররা হয় মাঝামাঝি আকারের ঠোঁটের অধিকারী। মূল প্রজাতিগুলোর লম্বা ঠোঁটের জন্য উপযোগী খাদ্য যেমন দ্বীপে আছে, বেঁটে ঠোঁটের উপযোগী খাদ্যও আছে– কিন্তু মাঝামাঝি ঠোঁটের উপযোগী খাদ্য নেই। এ জন্য খাদ্যাভাবের ফলে সংকরদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে এক সময় দ্বীপে অধিক আর্দ্রতায় নতুন ধরনের উদ্ভিদ হতে আরম্ভ হল যাদের বীজ অপেক্ষাকৃত ছোট ও নরোম। এ বীজগুলো কিন্তু মূল প্রজাতির চেয়ে এই সংকরদের জন্যই অধিক খাদ্যের সৃষ্টি করল। ফলে সংকরের সংখ্যা বেড়ে গেল হুহু করে, মূল প্রজাতি কমে গেল।

আসলে বিবর্তনের ক্ষেত্রে সংকরায়ন-প্রক্রিয়াটি প্রায় মিউটেশনের কাজ করতে পারে– প্রজাতিসীমার বাইরে গিয়ে নতুন জিন অনুপ্রবেশ করিয়ে এবং তার ফলশ্রুতিটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের হাতে ছেড়ে দিয়ে। এ ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক নির্বাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমী ঘটনাকে শাস্তি দিয়ে তাকে দমন করে। কিন্তু কোনো-কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে জিনের অনুপ্রবেশটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হয়ে ওঠে এবং বিবর্তনে নতুন সম্ভাবনার ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে ।

কোন কোন জিনের এভাবে অনুপ্রবিষ্ট হবার প্রবণতা অন্যান্যের চেয়ে বেশি। উদাহরণস্বরূপ আগাছানাশক ও কীটনাশকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার যে জিন সেটি সুবিধাজনক বলে সহজেই অনুপ্রবিষ্ট হতে চায়। ফলে কীটনাশককে অকার্যকর করার কাজে সংকরায়নের একটি হাত থাকতে পারে। আধুনিক পরিবেশবাদীরা এই নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। আমরা ফসলের মাঠে জিন-কারিগরির সৃষ্ট ট্রান্সজেনিক ফসল আমদানি করছি এই আশায় যে, এরা আগাছা ধ্বংসের ওষুধ সহ্য করে থাকবে– আগাছা মরবে অথচ ফসল মরবে না। কিন্তু এখান থেকে অন্যান্য জিন, যেমন বন্ধ্যা হবার জিন, যদি সমধর্মী অন্য ফসলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে তা হলে তো মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে। তা

ছাড়া বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য যাঁরা ভাবেন, কখনো-কখনো সংকরায়ন তাঁদের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নতুন কোনো কাছাকাছি প্রজাতি বাইরে থেকে আনয়নের পর তাদের সঙ্গে সংকরায়নের ফলে স্থানীয় বিশুদ্ধ প্রজাতি বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে এমন ঘটনা ঘটেছে।

এসবের ফলে সংকর-এর বিরুদ্ধে নতুন করে বৈষম্যমূলক আচরণের মনোভঙ্গি সৃষ্টি হচ্ছে। আসলে বিশুদ্ধ প্রজাতির উপর আমাদের অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলেই এ ধরনের মনোভঙ্গি টিকে যাচ্ছে বা আরো জোরদার হচ্ছে। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রজাতিকে আদৌ কেন গুরুত্ব দিতে হবে যে প্রশ্নটি এখন অনেকে করছেন। সংকরায়ন এবং জিন-অনুপ্রবেশকে যদি আমরা প্রকৃতির স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়া বলে মেনে নিই তা হলে কিন্তু ঐ বৈষম্য মনে আনার কোনো সুযোগ থাকবে না।

মোটা হবার ভাইরাস!

অনেক মানুষের চির দুঃখ হল শরীরের মেদ কমাতে না পারা। ওজন কমানো, মুটিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করা এ নিয়ে রাতদিন উদ্বিগ্ন থাকেন, এমন মানুষের সংখ্যা দুনিয়ার ঘরে-ঘরে। এ জন্য ডায়েটিং করা, প্রায় অনাহারে থাকা, কঠিন ব্যায়াম, ক্ষুধা কমানোর ওষুধ খাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কষ্টকর পথ অবলম্বন করতে অনেকে দ্বিধা করেন না। মোটা থাকা, মোটা হওয়া শুধু স্বাস্থ্য-বিরোধী নয় এটি ফ্যাশান-বিরোধীও বটে। এজন্য এতসব সত্ত্বেও যারা মুটিয়ে যাওয়াটা কমাতে পারেন না তাদের মনোকষ্টের সীমা থাকে না।

মুটিয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে এবং তা প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানত বংশগত প্রবণতা থাকা এবং জীবনযাত্রার ধরনকে বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাসকে দায়ী করা হয়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি সবাইকে চমকে দিয়ে যে নতুন তত্ত্ব এ সম্পর্কে আবিষ্কৃত হয়েছে তা হল, একটি বিশেষ মুটিয়ে-যাওয়া ভাইরাসে আক্রান্ত হলে যে কোনো লোক মোটা হয়ে যেতে পারে। মোটা হওয়ার বিষয়টি অনেকটা সর্দি লাগার মতোই– অন্যের কাছ থেকে এটি সংক্রামিত হতে পারে ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে। এ জন্য বংশগত বা অন্য কোনো রকমের কারণের প্রয়োজন হবে না।

এ রকম তত্ত্ব নতুন বলেই এটি সবাইকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু একে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেয়ারও উপায় নেই, অন্তত আজকালকার দিনে। পাকস্থলীর আলসার জীবাণুর আক্রমণের ফলে সৃষ্টি হতে পারে, এমন কথা কিছু কাল আগেও অবিশ্বাস্য ছিল। তখন কিন্তু সবাই জানে, এমন আলসারের চিকিৎসা এখন এই জীবাণুকে দমন করার মধ্যেই।

মুটিয়ে যাওয়ার ভাইরাস সম্পর্কে নতুন তত্ত্বের সূচনাটি ঘটেছে ভারতের বোম্বাইতে। সেখানে একজন চিকিৎসক নিখিল ধূরন্ধর মেদবহুল মানুষের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ। একদিন তাঁর বন্ধু পশু-প্যাথোলজিস্ট শারদ অজিনকিয়া কথায়-কথায় বললেন, একটি বিশেষ ভাইরাসের আক্রমণে মুরগির মড়ক দেখা দিয়েছে, এবং অদ্ভুত ঘটনা হল যে মুরগিগুলো মারা যাচ্ছে সেগুলো রোগে শুকিয়ে যাওয়ার বদলে বরং বেশ মেদবহুল হয়ে পড়ছে। দুই বন্ধু মিলে বিষয়টা তদন্ত করে দেখতে চাইলেন। তাঁরা ঐ ভাইরাসটি ল্যাবোরেটরির সুস্থ কিছু মুরগির মধ্যে ইনজেকশন দিয়ে ঢোকালেন। দেখা গেল ছয় সপ্তাহের একই দলের সাধারণ মুরগির তুলনায় এগুলো প্রায় দেড়গুণ মোটা হয়ে পড়ল। অথচ এদের কোলেস্টরোল বাড়ল না।

এবার নিখিল তাঁর মুটিয়ে-যাওয়া রুগিদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখলেন ৫২ জন রুগির মধ্যে যে দশ জন সবচেয়ে মোটা তাদের রক্তে এই ভাইরাসটির এণ্টিবডি রয়েছে। আর তাদের কোলেস্টরোলের মাত্রাও অস্বাভাবিকরকম কম। তিনি বিষয়টির মধ্যে গুরুত্ব খুঁজে পেলেন। তাঁর কাছে বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে হল যে, পশ্চিমা বিজ্ঞানীদেরকে এ সম্পর্কে আগ্রহী করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তিনি নিজেই নিজের রমরমা প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনিশ্চয়তার জীবন বেছে নিলেন।

লক্ষ করে দেখা গেছে ১৯৮০ সালের পর থেকে দুনিয়ার বহু দেশে মুটিয়ে যাবার প্রবণতা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে এটি বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। তুলনা করার সুবিধার্থে এটি মাপা হয় দেহ-ওজন ইনডেক্স দিয়ে। কিলোগ্রামে শরীরের ওজনকে মিটারে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করে এই ইনডেক্সটি পাওয়া যায়। ধনী-দরিদ্র দেশ নির্বিশেষে জনসংখ্যার মধ্যে এই ইনডেক্সের ঊর্ধ্বগতি অনেকের কাছে আশঙ্কাজনক বলে মনে হচ্ছে। খাদ্যে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ব্যায়ামের পরিমাণ হ্রাস এরকম কিছু দিয়ে ব্যাপারটি ঠিক পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাডিসনে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড এটকিন্সনও হালকাভাবে ভাবছিলেন মুটিয়ে যাওয়ার সংক্রামক রোগের কথা। কারণ তিনি পশুপাখির মধ্যে এরকম তিনটি ভাইরাসের কথা জানতেন যেগুলো মস্তিষ্কে কাজ করে ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয়। এবার এটকিন্সন আর নিখিল ধূরন্ধর জুটি বাঁধলেন জিনিসটি তলিয়ে দেখার জন্য।

যেহেতু বোম্বাইয়ের সেই মুরগিমড়কের ভাইরাস যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করার অনুমতি পাওয়া গেল না, তাঁরা Ad-36 নামে অনুরূপ আর একটি ভাইরাসের উপর কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন যা ঐটির সঙ্গে একই গোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীর অন্যান্যের চেয়ে

যথেষ্ট আলাদা। দেখা গেল মুরগির ক্ষেত্রে মুটিয়ে দেবার জন্য এই ভাইরাস আরো বেশি কার্যকর। এর ফলে মুরগির ওজন বেড়ে যায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। এভাবে বাছাই করেই সুফল পাওয়াতে তাঁদের ধারণা হল বেশ কিছু ভাইরাসের এই প্রবণতা রয়েছে। Ad-36 ইঁদুরের মধ্যে প্রয়োগ করেও একই ফল পাওয়া গেল। বানরের উপর প্রয়োগ করে দেখা গেল, ওজন তিন গুণ বেড়ে যাচ্ছে ৬ মাসের মধ্যে। শুধু তাই নয়, কোলেস্টরোল-মাত্রা কমে যাচ্ছে। মুরগিকে অবিশ্বাস করা গেলেও বানরের ক্ষেত্রে দেখার পর বিষয়টিকে উড়িয়ে দেয়ার উপায় আর রইল না। অনেকে ভাবলেন, মুটিয়ে যাওয়ার সঙ্গে ভাইরাসের সম্পর্ক থাকতেও পারে।

এই সম্পর্ক সবাইকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল। তার মানে কি এই— এরকম ভাইরাস কোনোভাবে শরীরে ঢুকলে আর রক্ষা নেই! অতীতে যা-ই থাকি না কেন —এবার বেঢপভাবে মুটিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। অবশ্য এর আরো এক ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে। হয়তো ভাইরাসের এণ্টিবডি মোটা লোকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তার কারণ মোটা লোকরা এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি সংবেদি। কারণ অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, স্থূলতা মানুষের প্রতিরোধক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। কাজেই পরীক্ষার মাধ্যমে এই বিষয়টিরও নিষ্পত্তি হওয়া উচিত— ভাইরাস ঢুকেছে বলে মোটা হয়, না মোটা হয়েছে বলে ভাইরাস ঢুকেছে।

এর জন্য নিখিল ও এটকিন্সন এই গোষ্ঠীরই আরো তিনটি ভাইরাস Ad-2, Ad-31 এবং Ad-37-এর এণ্টিবডির খোঁজ করলেন পরীক্ষাধীন মানুষের রক্তে। এবার কিন্তু কৃশ এবং স্থূল নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে এই এণ্টিবডিগুলো একই পরিমাণে পাওয়া গেল। তাছাড়া কোলেস্টরোল কম পাওয়ার যে ঘটনাটি Ad-36 -এর ক্ষেত্রে বা মুটিয়ে যাওয়ার অন্যান্য ভাইরাসের ক্ষেত্রে অবধারিতভাবে ঘটছিল, এক্ষেত্রে কিন্তু তাও দেখা গেল না। আরো নিশ্চিত হবার জন্য তাঁরা ৮৬ জোড়া অভিন্ন যমজের উপর পরীক্ষা করে এমন ২৬ জোড়া যমজের সন্ধান পেলেন, যাদের একজনের দেহে Ad-36 এণ্টিবডির আধিক্য আছে, অন্য জনের নাই। এদের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যার-যার এ আধিক্য রয়েছে যে তার অভিন্ন যমজ ভাই/বোনের তুলনায় অনেক বেশি মোটা। স্পষ্টত সব জেনেটিক গঠন একই হওয়া সত্ত্বেও ভাইরাসটি এ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অথচ অন্য তিনটি ভাইরাস এণ্টিবডির সঙ্গে এই সম্পর্কগুলো খুঁজে পাওয়া যায় নি।

প্রথম দিকে বিশ্বজোড়া শারীর তত্ত্ববিদ বিজ্ঞানীরা মুটিয়ে যাওয়ার ভাইরাসতত্ত্বকে হেসে উড়িয়ে দিলেও এখন সবাই তা দিচ্ছেন না। অনেকে স্বীকার করছেন যে, অন্তত কিছু পশুপাখির ক্ষেত্রে ভাইরাসজনিত স্থূলতার বিষয়টি রয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে আরো সরাসরিভাবে এটি এখনো প্রমাণিত হয় নি, আর প্রমাণ করা সহজও

নয়। কারণ তা হলে এক দল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে পরীক্ষা চালাতে হবে যাদের অর্ধেককে এই ভাইরাসে আক্রান্ত করে দেখতে হবে যে, অন্য অর্ধেকের তুলনায় তাদের মধ্যে মুটিয়ে-যাওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়েছে কি না। কিন্তু এভাবে সুস্থ মানুষে ভাইরাস সংক্রমণ নৈতিকতার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য পরীক্ষা হবে না।

তবে তার বিকল্প হিসাবে যা করা যায়, তা হল ভাইরাস আণবিক স্তরে কীভাবে মুটিয়ে যাওয়ার সিগন্যাল দেয় সেই প্রক্রিয়াটিকে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা। অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারলে, তখন মানুষের ক্ষেত্রে ওটি কাজ করছে কি না দেখা যাবে। ইঁদুরের অপরিপক্ব চর্বিকোষের সঙ্গে টেস্টটিউবের মধ্যে Ad-36 ভাইরাস দিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এতে চর্বিকোষ পরিপক্বতা লাভ করার সম্ভাবনা তিন গুণ বেড়ে গেছে। কাজেই ব্যাপারটি দাঁড়াল এই যে, Ad-36 ভাইরাস আক্রান্ত প্রাণীর দেহে চর্বিকোষের আধিক্য যেমন রয়েছে, তেমনি ভাইরাসটির প্রভাবে ক্ষীণ চর্বিকোষগুলো তাদের চর্বি জমাবার কাজটিও ভালো করছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন সংক্রান্ত সংকেতগুলো এটি তখন বেশ চাঙ্গাভাবেই দিতে পারে। এর সার্বিক ফলশ্রুতি হল দ্রুত মোটা হয়ে পড়া।

একই সঙ্গে চেষ্টা করা হচ্ছে বুঝতে মোটা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভাইরাস কীভাবে কোলস্টেরোল না বাড়িয়ে বরং কমিয়ে ফেলছে। রক্তে কোলেস্টরোল কমার কয়েক ধরনের মানে হতে পারে। বাড়তি কোলেস্টরোল হয়তো ধমনীর দেয়ালে জমা হচ্ছে যা রোগির জন্য মারাত্মক। না কি ওটা লিভারে গিয়ে সেখানে ভেঙে শরীরের বর্জ্যের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। না কি ভাইরাস কোলেস্টরোল সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকেই অবদমিত করে দিচ্ছে। এই উভয় ক্ষেত্রে ভাইরাসের এই ক্রিয়া বুঝতে পারলে আমাদের মস্ত লাভ। তখন এর অনুকরণে অন্যভাবে একই প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে কোলেস্টরোল নিয়ন্ত্রণের ভালো ওষুধ পাওয়া যাবে।

শেষ পর্যন্ত মুটিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভাইরাসের ভূমিকাটি যদি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তা হলে মুটিয়ে যাওয়ার চিকিৎসাটিও আমাদের প্রচেষ্টার মধ্যে আসতে পারবে। এণ্টিভাইরাস ওষুধের মাধ্যমেই হয়তো তখন অবংশগত স্থূলতাগুলোকে চিকিৎসা করা যাবে। এমনও হতে পারে যে, এই ভাইরাসের টিকাও আবিষ্কৃত হবে, যার ফলে আগে থেকেই মানুষ মুটিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে।

সাধারণত মোটা মানুষদের সম্পর্কে অনেকে বিরূপ ধারণা পোষণ করে— তারা লোভী, শুধু খাই-খাই করে, তাই মোটা হয়েছে। কথাটি অনেক ক্ষেত্রে সত্য না হলেও এ রকম ধারণা পোষণ করা হয়। এখন ভাইরাসের ব্যাপারটি সঠিক প্রমাণিত হলে এরকম বিরূপ ধারণা কমবে বলে আশা করা যায়। অন্য দশটা

ভাইরাসজনিত অসুখের মতো এও একটি দুর্ভাগ্যজনক অসুখ বলেই মানুষ মেনে নিতে শিখবে। তবে একটি ভয়ও রয়েছে। Ad-36 গোষ্ঠীর ভাইরাসগুলো কিন্তু বেশ ছোঁয়াচে। তখন মোটা মানুষের সংস্পর্শে এসে ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মোটা হবার ভয় থাকবে। এই ভয়ে আবার নতুন এক ধরনের বিড়ম্বনা তাদের ভাগ্যে নেমে আসতে পারে। এটি অবশ্য নির্ধারিত হবে মুটিয়ে যাবার ভাইরাস কতদিন ধরে বাহিত হতে পারে। একজনকে আক্রান্ত করে, তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটাবার পর সে কি সংক্রমণযোগ্য রূপে থেকে যায়, না থাকে না? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, একটি পর্যায়ের পর আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে ভাইরাসের এন্টিবডি দেখা গেলেও তিনি আসলে তখন আর ভাইরাস বহন করছেন না।

চায়ের কাপে তুফান

ড্রাগের নেশা নিয়ে যখন দুনিয়ার সকল সচেতন মানুষ উদ্বিগ্ন সে সময় একটি নেশা কিন্তু আমরা সবাই মিলে করে যাচ্ছি– সেটি হলো ক্যাফেইনের। কফি, চা, কোলা পানীয়, চকোলেট– ইত্যাদি রূপে সারা দুনিয়ার মানুষ প্রায় নিয়মিত ভাবেই ক্যাফেইন সেবন করছি। অথচ অনেকের মতে এটিও একটি নেশার ড্রাগ যার নানা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বিষয়টি বিতর্কিত, তবে একই সঙ্গে এটি নিয়ে গবেষণারও অন্ত নেই।

প্রশ্নটি হলো এটি কি নেশা, না এটি নেশা নয়। উভয় পক্ষে বক্তব্য আসছে গবেষণার ফলাফল থেকে। সম্প্রতি ফরাসী জাতীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণা

ইনস্টিটিউট জানিয়েছে যে পরীক্ষাগারে ইঁদুরকে পরিমিত পরিমাণ ক্যাফেইন দিয়ে দেখা গেছে যে এটি মস্তিষ্কের নিউক্লিয়াস এক্যুম্বেন অঞ্চলের সক্রিয়তা বাড়ায় না।

অথচ মনে করা হয় যে নেশার আসক্তির একটি প্রধান অনুসঙ্গ হলো এখানকার সক্রিয়তা বৃদ্ধি। কোকেন, এমফেটামিন, নিকোটিন, মরফিন ইত্যাদি সব রকম ড্রাগে সামান্যতম রেশও মস্তিষ্কের এই অঞ্চলকে উত্তেজিত করে। কিন্তু নেশার অন্যান্য সব অনুষঙ্গও রয়েছে, যেগুলোর দিকে তাকানো প্রয়োজন।

ক্যাফেইনের সঙ্গে অন্যান্য ড্রাগের একটি দিকে মিল রয়েছে। এরা সবাই শরীরে ডোপামিন মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। যেমন ক্যাফেইন আমাদেরকে কিছুটা জাগ্রত ও সচেতন অনুভব করায় তার কারণ আডেনোসিন নামের মস্তিষ্কের একটি রাসায়নিক দ্রব্যের গ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। মস্তিষ্কের স্নায়ু-পরিবহনকে মন্থর করে দেয়ার ব্যাপারে আডোনোসিনের ভূমিকা রয়েছে। একে বন্ধ করার সঙ্গে মস্তিষ্কের অনুভূতি চাঙ্গা করার আর ডোপামিন মাত্রা বাড়ানোর যোগসূত্র রয়েছে। এদিক থেকে ক্যাফেইনের এমন কিছু অনুভূতি সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে যা নেশার ড্রাগগুলোরও রয়েছে।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন ক্যাফেইনের দ্বারা ডোপামিন বৃদ্ধিতে একটি সুখপ্রদ ভাব সৃষ্টি করতে পারে বটে, তবে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে নেশা বলা যায় না। ক্যাফেইনের এবং ড্রাগের কাজের পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আর একদল বিজ্ঞানী মনে করেন ক্যাফেইনের সঙ্গে নেশার সম্পর্কটি উড়িয়ে দেবার মত নয়। অন্যান্য ড্রাগের মতই এর একটি আসক্তি জন্মে, এবং সেগুলোর মতই হঠাৎ করে এর অভ্যাস ছেড়ে দেবার চেষ্টা করলে প্রত্যাহার জনিত সমস্যা দেখা দেয়া। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক একটি পরীক্ষা বেশ মজার। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীকে একদিন কিছু ক্যাপসুল খেতে দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ক্যাফেইন ছিল। ক্যাপসুলগুলোর মধ্যে কেউ পেয়েছে লাল রঙের, কেউ নীল রঙের। পরের দিন ক্যাপসুলে কোন কিছুই ছিল না– তাও ঐ লাল ও নীল রঙের। তৃতীয় দিন ঐ দুই রঙের ক্যাপসুল দিয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের তার থেকে যে কোন একটি বেছে নিতে বলা হয়েছে। যদিও তাদের কখন কোন্টার মধ্যে কি ছিল কখনো বলা হয়নি, শুধু বলা হয়েছে যে এতে সাধারণ খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টি উপাদান আছে– তবুও বাছাই করার সময় শতকরা ৮০ জন সেই রং বেছে নিয়েছে যে রঙের ক্যাপসুলে ক্যাফেইন ছিল। এর থেকে স্পষ্ট যে ক্যাফেইনের আসক্তি শরীর বুঝতে পারে এবং তারই চাহিদা সৃষ্টি হয়। পরে ওটি না পেলে এক ধরনের হতাশাও জন্মে। এগুলো নেশার লক্ষণ।

এটি অবশ্য ভোরে যারা চা বা কফির প্রত্যাশা করেন তাদের নূতন করে বলার কোন অপেক্ষা রাখে না। একদিন যদি চা পান না করেই সকালে কাজে বের হয়ে যেতে হয় অভাবটি যে কিভাবে কাজকর্মে প্রভাব ফেলে সেটি কে না লক্ষ্য করছে।

ক্যাফেইনে অভ্যস্থ মানুষকে এটি ছাড়া চলতে হলে উপসর্গ যেগুলো দেখা দেয় তা নেহাৎ তুচ্ছ করার মত নয়।

এ ধরনের প্রত্যাহার উপসর্গ দেখা দেবার জন্য যে জবরদস্ত রকম কফি-খোর বা চা-খোর হতে হবে একন কোন কথা নেই। দৈনিক ১০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইনে অভ্যস্ত এমন মানুষের জন্যও উপসর্গগুলো স্পষ্ট হতে পারে। এইটুকু ক্যাফেইন মাত্র দুই কাপ চায়ে অথবা এক কাপ সাধারণ ইনস্ট্যান্ট কফিতেই পাওয়া যায়। প্রত্যাহার উপসর্গের মধ্যে থাকে মাথা ধরা, অবসাদ, মনোযোগের অভাব, ঝিমানো ভাব। ক্যাফেইনবর্জিত অবস্থায় দুই একদিন কাটানোর পর উপসর্গগুলো চরমে উঠে এবং এভাবে এক সপ্তারও বেশী চলতে পারে। অবশ্য দেখা গেছে যে আগে নিয়মিত ভাবে যেটুকু ক্যাফেইনের অভ্যাস ছিল তারচেয়ে অনেক কম মাত্রায় এটি গ্রহণ করলেও উপসর্গের ভাবগুলো হ্রাস পায়। যেমন কেউ যদি দৈনিক তিন কাপ কফিতে অভ্যস্ত হয় (৩০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন), তা হলে মাত্র ২৫ মিলিগ্রামে নেমে গিয়েও প্রত্যাহার উপসর্গকে প্রতিকার করা যায়। যেমন ধরা যাক সকালের-দুপুরের কফি কারো বাদ পড়লো। তিনিই যদি একটি কোলা জাতীয় পানীয় পান করেন তাতেই তাঁর অভাবজনিত ভাবটি অনেকটা কেটে যাবে। অথচ এক বোতল পানীয়ের মধ্যে রয়েছে মাত্র ৩০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন।

মানুষের শরীর তার অভ্যস্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যাফেইন স্বাভাবিক ক্ষেত্রে খুঁজে নিতে চায় যদি সেটা পাওয়া যায়। কেউ যদি গাঢ় চায়ের এক কাপে অভ্যস্ত হন, তবে পাতলা চা দিলে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই দু'কাপ খাবেন। অন্যান্য নানা নেশার মত ক্যাফেইনেরও একটি সহনশীলতার ব্যাপার আছে। যে বেশী কফি খেতে অভ্যস্ত নয় তাকে একদিন ৪০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন খাওয়ালে (৪ কাপ) নিশ্চিত ঘুমের সমস্যা হবে। কিন্তু এমনিভাবে যদি এক সপ্তাহ চলতে থাকে তখন সমস্যাগুলো আর থাকে না– শরীর উচ্চ ক্যাফেইনে সয়ে যায়।

ক্যাফেইনের একটি জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হলো ক্যাটেকোলামাইন বৃদ্ধি। এটি হলো এমন একটি স্নায়ু-পরিবাবহক যা 'হয় লড়ো নয় পালাও' এ ধরনের সাড়া সৃষ্টিকারী। এর বৃদ্ধি ঘটলে উত্তেজক অনুভূতি হয়, পিউপিল চোখের বিস্ফারিত হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয়, পেশীগুলো এ্যাকশনের জন্য তৈরী হয়ে যায়। সবাই অবশ্য ঠিক একইভাবে সাড়া দেয় না তাদের গড়নের কারণে - কিন্তু মোদ্দা ব্যাপারটি এরকমই।

ক্যাফেইন কতক্ষণ কার্যকর থাকবে তা নির্ভর করবে এর প্রভাবের অর্ধ-আয়ুর উপর। যতক্ষণে প্রভাব মূল পরিমাণের অর্ধেকে নেমে আসে, সেটিই অর্ধ-আয়ু। এটি সাধারণত চার ঘন্টা, তবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পিল নিচ্ছে এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে

দীর্ঘতর, প্রায় দ্বিগুণ সময়। কিন্তু নিয়মিত ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এটি অর্ধেক - মাত্র ২ ঘন্টা। অর্থাৎ ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে চা-কফির প্রয়োজনীয়তা আবার দেখা দেয় অনেক তাড়াতাড়ি। ধূমপান আর কফি পানের প্রবণতা মানুষের একই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এটি বেশী লক্ষ্য করা যায় যখন কেউ ধূমপান ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু চা-কফি পানের পরিমাণ আগের মতই রেখে দিয়েছে তখন। তখন তাদের মধ্যে উচ্চ ক্যাফেইনের উপসর্গগুলো দেখা দেয়–অনিদ্রা, অস্থিরতা ইত্যাদি। ধূমপান ছাড়ার প্রচেষ্টার এটি একটি বিঘ্ন হিসাবে আসতে পারে– যদি না ক্যাফেইনও একই সঙ্গে কমিয়ে আনা হয়।

এবার আসা যাক সেই আসল প্রশ্নে চা কফি পান আদৌ ক্ষতিকর কিনা। এ সম্পর্কিত বিতর্ক অন্তত কয়েকশত বছর পুরানো। ইংল্যান্ডে যখন প্রথম চা জনপ্রিয় হচ্ছে তখন ১৬৭৪ সালে লন্ডনের মহিলারা পুরুষত্বহীনতার জন্য অতিরিক্ত চা পানকে দায়ী করেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় 'চা পান আর জাতির সর্বনাশ' এই মর্মে একটি রীতিমত আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। আর এই সেদিন ১৯৭০ এর দশকেও বিজ্ঞানীরা কফি পানের সঙ্গে হার্টের অসুখ, প্যানক্রিয়াসের ক্যানসার এবং প্রজননতন্ত্রের নানা অসুখের সম্পর্কের অভিযোগ করেছেন আজ অবধি যা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

তবে কিছু কিছু ঝুঁকির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ একটি কারণ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এটি রক্তচাপ বাড়ায় এবং সেই কারণে পরবর্তীতে হার্টের অসুখের কারণ ঘটাতে পারে। প্রতিদিন চার পাঁচ কাপ কফি খেলে রক্তচাপ পাঁচ ঘর বৃদ্ধি পেতে পারে এমন প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া ক্যাফেইন মানসিক চাপ বাড়ায়। যে সব কাজে মানসিক চাপে থাকতে হয় সেখানে ঘন ঘন চা কফি খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে এমন প্রমাণ রয়েছে। সেটিই আবার চাপকে আরো তীব্র করে তুলতে পারে। এসব প্রভাবের পরিমাণ সম্পর্কে অবশ্য যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে কারণ গবেষণার মধ্যে জটিলতা প্রচুর। যেমন চা-কফির মধ্যে ক্যাফেইন ছাড়াও নানা দ্রব্য থাকে যাদের কোন কোনটি ক্যাফেইনের বিপরীত রকম কাজ করে। কফি বা চা এর সবকিছুকে প্রমিত করাটাও দুরূহ, কারণ এক এক ধরনের ব্রান্ডে, প্রস্তুতির প্রক্রিয়ায়, এগুলো ভিন্ন হয়। তাই বিজ্ঞানীরা এখন চা-কফি খাওয়ার পরিমাণ বা প্রকারের দিকে না তাকিয়ে বরং রক্তে ক্যাফেইনের সৃষ্ট উৎপাদ্য প্যারাজানথাইনের পরিমাণ মাপছেন। এভাবে তাঁরা দেখিয়েছেন যে গর্ভাবস্থায় কফি খেলে গর্ভপাত হবার সম্ভাবনা বাড়ে একথা শুধু অতি উচ্চ প্যারাজানথাইনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দৈনিক পাঁচ কাপের উপর কফি খেলেই এমনটি হতে পারে।

তবে গর্ভাবস্থায় এবং বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবারকালে মাদের চা-কফি সীমিত রাখা ভাল। কারণ ক্যাফেইন প্লাসেন্টার বাধা অতিক্রম করে রক্তের সঙ্গে গর্ভেও সন্তানের মধ্যে যায়, মায়ের দুধেও যায়। তাছাড়া গর্ভবতীর দেহে ক্যাফেইনে অর্ধায়ুও প্রায় দ্বিগুণ। এভাবে সন্তান যেটুকু ক্যাফেইন পায় তাতেই মায়ের গর্ভে তার হৃদ-স্পন্দনের গতি বেড়ে যেতে পারে।

ক্যাফেইনের পরিমাণ যাঁরা সীমিত রাখতে চান তাঁদের জানা উচিত ক্যাফেইন কিসে বেশী কিসে কম থাকে। ডিক্যাফিনেটেড কফিতে (এক কাপে ৫ মিলিগ্রাম), কালো চকলেটে (৩০ গ্রামে ৫ মিলিগ্রাম) এর পরিমাণ খুবই সামান্য। তবে এই কফিই যখন মেশিনে পরিশ্রুত করে কড়া কফির আকারে আসে তাতে অত্যধিক ক্যাফেইন থাকতে পারে (বড় কাপে ৪০০ মিলিগ্রাম)। সাধারণ সাদা মিল্ক চকলেটেও এর পরিমাণ বেড়ে ১৫ মিলিগ্রামের মত দাঁড়ায় (৩০ গ্রামে)। ইনস্ট্যান্ট কফিতে অবশ্য ক্যাফেইন অপেক্ষাকৃত কম (এক কাপে ১০০ মিলিগ্রাম)। টি ব্যাগে বানানো চায়ে পরিমাণ এর অর্ধেক (কাপে ৫০ মিলিগ্রাম), কোলা পানীয়ের ৩৫০ মিলিলিটার বোতলে ক্যাফেইনের পরিমাণ ২৫ মিলিগ্রামের মত।

সাধারণভাবে বিজ্ঞানীরা চায়ের কাপে তুফান তোলার পক্ষপাতী নন। তাঁরা মনে করেন বাড়াবাড়ি রকমের আসক্ত না হলে এর ক্ষতিকর দিক এমন প্রকট নয় যে ধূমপানের মত এর বিরুদ্ধে নামতে হবে। যেমন ধূমপানের ক্ষতিগুলো স্পষ্ট বলে মানুষ সহজেই একে বর্জনের পথে গিয়েছে। সাধারণত চা-কফি-কোলা-চকলেট সে রকম কিছু নয়। তবে এতে ড্রাগের মত উপাদান রয়ে গেছে সেটি মনে রেখে, সেদিক লক্ষ্য করে চা-কফির সাথে রফা করতে হয়।

এই নদী, এই পানি

বিষয়টি অতি সনাতন– শত শত বছর ধরে বহমান নদী আর যুগের পানির ভান্ডার। কিন্তু এ সম্পর্কে জানার কাজ কি শেষ? মোটেই নয়। এ নিয়েই রয়ে গেছে অসংখ্য চমকপ্রদ তথ্য, অনেক অবাক করা প্রশ্ন যেগুলো হয়তো আগে এভাবে মনেই হয়নি। বিষয়গুলোকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত করে সামনে এনেছেন লেখিকা ক্রীস পীলো, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে তাঁর সদ্য প্রকাশিত বই 'ফ্রেশ ওয়াটারে'।

নদী এঁকে বেঁকে যায়। ঢেউয়ের আকারে এঁকে বেঁকে যাবার একটি গড়পড়তা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রয়েছে– যতটুকু দূরত্বে দুদিকের একটি বাঁক সম্পূর্ণ হয়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো নদীর প্রশস্ততার সঙ্গে এই তরঙ্গ-দৈর্ঘের একটি সম্পর্ক আছে, এটি

প্রশস্ততার ১১ গুণ। কেন, তা গাণিতিকভাবেই দেখানো সম্ভব। নিস্তরঙ্গ সমতল নদীর পানি। হঠাৎ বাতাস দেখা দিল। এমনি পানিতে ঢেউ ফুঁসে উঠলো। কেন, তাও গণিতের ব্যাপার।

নদীর ভাঙ্গন ধ্বংসের কাজ। প্রমত্তা নদী ভাঙ্গে গড়ে, তলার মাটিও কর্ষণ করে নিয়ে যায়। কিন্তু কাজটি কি নদীর পানির? মোটেই নয়, অন্তত সরাসরি নয়। পানি যার গায়েই সংলগ্ন হয় সেখানেই একটি অতি পাতলা সুরক্ষা-পর্দার আবরণ দিয়ে যায়– পানির আঘাত তাই ভাঙ্গনের কাজ করতে পারেনা। তবে পানির সঙ্গে যদি থাকে পাথর, নুড়ি, বালি বা এ রকম অন্য বাহিত বস্তু যেগুলো হাতুড়ির মত আঘাত করতে পারে– সেগুলোই পাড় ভাঙ্গে, ক্ষয় করে তল।

নদী উজান থেকে ভাটির দিকে বয়। কিন্তু পানি কি শুধু ভাটিতেই যায়, উজানে যায় না ? ঘনিষ্ঠভাবে পানির গতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় নদী আসলে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে যাওয়া পানির ঘূর্ণি-গতি। আসলে দুটি ঘূর্ণি-প্রবাহ থাকে অধিকাংশ নদীর। পানির যে কোন অংশকে ঘূর্ণির বাঁকে অধিকাংশ সময় ভাটি থেকে উজানের দিকেই অগ্রসর হতে দেখা যায়, নদীর গতি পথের দিকে নয়। আর এই কারণেই নদীতে কিছু ভাসিয়ে দিলে তাকে সব সময় মাঝ-দরিয়ায় একটি সরু চ্যানেলে ভাসতে দেখা যায়, দুটি ঘুর্ণি-প্রবাহের মাঝ বরাবর।

নদী কি মাটি আর পানিকে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত করে ? অধিকাংশ ক্ষেত্রে করে না। নদীর পাড় ভাঙ্গে, এর গতি পথ বদলাতে থাকে। আর নদীর তল ? ওটাও কি সুনির্দিষ্ট ? তলায় গিয়ে নদীর প্রবাহ কি শেষ হয়ে যায়। মোটেই না, নদী তলের নীচেও রয়েছে আরো নদী। যেখানে ভূগর্ভে বয়ে যায় নদী– ধীর গতির হলেও এও এক নদী। প্রায়শই আসল নদীর চেয়ে বড় হয় ভূগর্ভের এই নদী– তলদেশে তারও থাকে নানা শাখা প্রশাখা– গোপন বহু আঁকাবাঁকা চ্যানেল।

সুপেয় পানির জগতে ভূগর্ভের পানির ভূমিকা বিশাল। এখানকার যে পানির আধার সেটি ভূপৃষ্ঠের যে কোন আধারের চেয়ে, মানব সৃষ্ট বিশাল হ্রদের চেয়েও অনেক বড়। কোন কোন জায়গায় এ পানির বয়স অনেক অনেক বেশি। তাই এ পানির দূষিত হবার আশংকা থেকে যায় বেশি। নদীর পানিও দূষিত হয়। তবে নদী নিজেই নিজের পানিকে নিত্য ধুইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ভূগর্ভের বিশাল আধারগুলোর কোন কোনটিতে পানি জমে আছে বহু হাজার বছর ধরে, যার কোন পরিবর্তন ঘটছেনা। সাহারা মরুভূমির নীচের জলাধারের পানি ৩৫০০০ বছর ধরে একটুও নড়েনি। মজার ব্যাপার হলো যে কোন জলাধারের পানি, তা সে ভূগর্ভেই হোক আর বাইরেই হোক, ৪৫ বছরের বেশি পুরানো হলে তা সহজেই বুঝা যাবে। কারণ সেক্ষেত্রে তাতে ট্রিশিয়াম পরমাণু থাকবেনা। ট্রিশিয়াম শুধু মিশেছে যে সব

পানিতে যা ৪৫ বছরের মধ্যে আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসেছে এবং বায়ুমন্ডলে বিস্ফোরিত বিভিন্ন পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষার দূষণের শিকার হয়েছে।

৩৫০০০ হাজার বছর পর সাহারার নীচের পানি কিন্তু এবার নড়তে শুরু করেছে– কারণ লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল গাদ্দাফী এটি তুলে এনে তাঁর বিখ্যাত মনুষ্য সৃষ্ট মরুনদীর সূত্রপাত করেছেন। গণিত কখনো কখনো নদী-বিজ্ঞানীকে বিভ্রান্ত করে। যেমন ম্যালিং ফরমূলার কথা ধরা যাক। শতবর্ষ পুরানো এই ফরমুলায় দেখানো হয়েছে নদী পারের লতাগুল্ম আর নদী তলের শৈবালের কারণে যে রুক্ষতা সৃষ্টি হয় তার ফলে নদী প্রবাহের গতি কিভাবে কমে যায় এবং প্লাবনের সম্ভাবনা বাড়ে। এই ফরমুলার শিকার হয়ে নদী-প্রকৌশলীদের হাতে যুগে যুগে বহু সুন্দর ঝোপঝাড় ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু ফরমুলাটি ধোপে টেকেনি।

নদী পারের, আর নদী তলের ঝোপ-ঝাড় এখন প্রশংসিত জিনিস। আগে ওদের নাম ছিল জলা-জংলা। এখন জলা-ভূমি, জল মহল। ইংরেজি ভাষাতে শব্দ প্রয়োগের এই বির্বতন আরো অর্থবহ। আগে ছিল 'বগ্' যা ছিল মন্দ, কারণ এর সংজ্ঞা– যেখানে গাছপালা ঝোপ-ঝাড়ের জংলায় নদীর সুশৃঙ্খল গতিপথ বদ্ধ হয়ে যায়। এখন সেটি 'ওয়েট ল্যান্ড'– উত্তম জিনিস। কারণ ওয়েট ল্যান্ড হলো জৈবিক ভাবে উর্বর, জীব-বৈচিত্রের প্রসূতি। তবে নামকরণের মাহাত্ম্য এখানেই শেষ নয়। 'বগ্' থেকে 'ফেন', 'ফেন' থেকে 'মার্ম', তার থেকে 'মায়ার'– এদের পার্থক্যগুলো সূক্ষ্ম– সব সময় বুঝে উঠা যায় না। তবে একটির থেকে পরেরটি কিছুটা উত্তম।

মানুষ-সৃষ্ট বাঁধগুলো এখন নিন্দিত জিনিস, কারণ বাঁধের উপরে আর নীচে এরা নদীর পরিবেশে সুসমতা নষ্ট করে। যে বিপুল পরিমাণ জলজ উদ্ভিদকে এরা আটকে দেয়, পচিয়ে ফেলে তা নানা রকম জীবাণুর জন্ম দেয়। এর কোন কোন জীবাণু মাটির পারদকে বিষাক্ত মিথাইল পারদে পরিণত করে– মাছের মধ্যে এবং মাছের ভোক্তা মানুষের মধ্যে, বিষময়তা সৃষ্টি করে। শুধু কি তাই ? বাঁধের প্রচন্ড চাপ নিয়ে স্পিলওয়ে দিয়ে যখন পানি ছাড়া হয় তখন তার তোড়ে পানিতে এত বাতাস মেশে যে কাছাকাছি সঞ্চরমান মাছের শরীরে বাতাসের বড় হেরফেরে সেগুলো মরতে থাকে।

না সব তথ্য অবশ্য বাঁধের বিপক্ষে নয়, সপক্ষেও কিছু আছে। পৃথিবীর সব বাঁধ যে পরিমাণ পানিকে আটকে রেখেছে তা একত্র করলে ১০ হাজার কিউবিক কিলোমিটার হবে। এ পানি শুধু বাঁধের জন্যই সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারছেনা। যদি সমুদ্রে যেতে পারতো তা হলে সমুদ্রের জল-তল তখনই আরো সেন্টিমিটার ফেঁপে উঠতো। একে তো গ্রীন হাউজ এফেক্টে ত্রাহি অবস্থা। বাঁধ অন্তত এইটুকু তো বাঁচিয়েছে ?

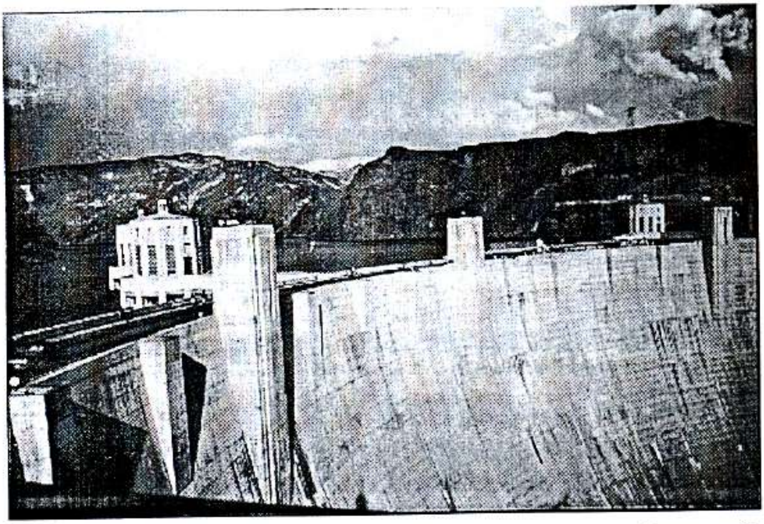

তবে ক্ষতির পাল্লাটাই ভারী। শুধু পরিবেশের ব্যাপার নয়– পুরো পৃথিবীর আদলটি নিয়েই টান দিয়েছে বাঁধে আটকে পড়া পানি। বাঁধে আটকানো কৃত্রিম জলাধারগুলোর বিপুল পানি পৃথিবীর ত্বককে চাপ দিয়ে তার গঠন বদলে দিচ্ছে– ঘন ঘন ভূমিকম্পের কারণ ঘটাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এটি পৃথিবীর ঘর্ষণের গতি পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিচ্ছে। এর কারণ আটকানো পানি সর্বত্র সমানভাবে নেই। নিরক্ষীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ জায়গাই সমুদ্র। মধ্য অক্ষাংশেই রয়েছে বাঁধে আটকানো সব পানি। অর্থাৎ যে পানির অধিকাংশ থাকার কথা ছিল নিরক্ষীয় অঞ্চলে, তা এখন যেন গুটিয়ে এনে রাখা হয়েছে মধ্য অক্ষাংশ অঞ্চলে। এই অক্ষাংশগুলো যেহেতু পৃথিবীর অক্ষ রেখার অপেক্ষাকৃত কাছে, এর ফলে অক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি বেড়ে যাচ্ছে– যেমন করে স্কেটিংরত ঘূর্ণায়মান অলিম্পিক স্টার তাঁর হাতটি গুটিয়ে শরীরের কাছে নিয়ে আসলে তাঁর ঘূর্ণন গতি বৃদ্ধি পায়। হিসেব করে দেখা গেছে এর ফলে দিনের দৈর্ঘ্য এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ হ্রাস পেয়েছে। চিন্তিত হবার মত কিছু নয়– কিন্তু বলা যায় না, এর থেকে নূতন উপসর্গ কি দেখা দেয়। তাছাড়া পৃথিবীর মাঝখানের চেয়ে উত্তরের দিকে পানি যে বেশি জমা রয়েছে– তার ফলে পৃথিবীর অক্ষটাই একটু বেঁকে গেছে। উত্তর আর দক্ষিণ মেরু এর জন্য ৬০ সেন্টিমিটারে সরে গেছে। নদীর পানিতে বাঁধ দেয়ার ফলে এই সব সূক্ষ্ম অথচ বিশ্বব্যাপী প্রভাবের কথা কি আমরা ভেবে দেখছি ?

মৌমাছির জগতে জন্মশাসন:
আত্মীয়তার মাপজোক

রাণীর রাজ্যে স্ত্রী-শ্রমিক

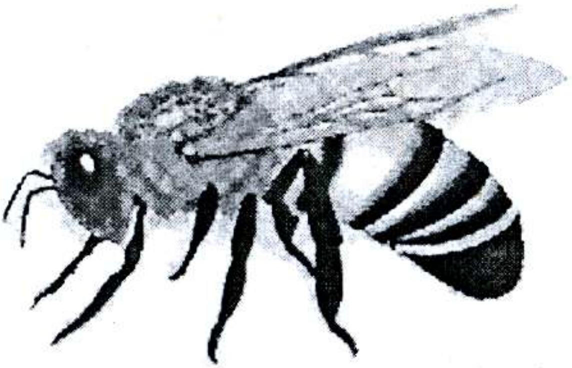

মৌমাছি, বোলতা, পিপড়া ইত্যাদির সামাজিক জীবন অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত। সাধারণভাবে দেখলে মনে হবে ওদের জীবনটাই সমাজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত– নিজের বলে কিছু নেই। তাই মৌমাছি শ্রমিক নিজেরা স্ত্রী-জাতীয় হয়েও সন্তান পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের ডিম পাড়ার স্বাভাবিক ইচ্ছা নিবৃত্ত করে। যেহেতু সেই কাজ দক্ষভাবে করার ভার রাণীর উপরেই ন্যস্ত রয়েছে। শুধু তাই নয়, যে কেউ তার চাকের প্রতি হুমকি হয়েছে মনে করলেই সে হুল ফুটিয়ে সেটি রক্ষা করে। যদিও এই হুল ফুটানোর মাধ্যমে তার পেট ছিড়ে গিয়ে নিজের জীবনটা তাকে আত্মাহুতি দিতে হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে সমষ্টির জন্য

একের যে এই সব ত্যাগ, তা মৌমাছিরাও কিছুটা হিসেব নিকেষ করেই করে, একেবারে নিঃস্বার্থভাবে নয়। তাছাড়া তাদের মধ্যেও প্রবণতা থাকে এই সব কড়াকড়ি সামাজিক নিয়ম ভাঙ্গার, এবং সেই প্রবণতা কঠোরভাবে দমন করার পুলিশি ব্যবস্থাও সমাজের ভেতরেই রয়েছে। তা সত্ত্বেও সেখানে আইনশৃঙ্খলার অবস্থা মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়ে এবং সমাজে নৈরাজ্যেরও সৃষ্টি হতে পারে এর ফলে।

মৌমাছি শ্রমিকদের নিজের সন্তান জন্ম দেয়ার আকাঙ্খা ত্যাগ করার কথাটিই ধরা যাক। বিবর্তনের দৃষ্টিতে যে কোন প্রাণির সন্তান জন্ম দেয়ার আকাঙ্খাকে দেখা যায় নিজের জেনেটিক বৈশিষ্টগুলো বিস্তৃত করার আকাঙ্খা হিসাবে। শ্রমিক মৌমাছি হিসেব করে দেখেছে নিজে সন্তান জন্ম দিলে সেই উদ্দেশ্য যতটা না সাধিত হবে সকলের সাধারণ মা, রাণীর সন্তানদের অর্থাৎ নিজের বোনদেরকে যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখলেই বরং সেটি বেশি হবে। তাই তারা ঠিক সেটিই করে। তবে একেবারে সব সময় নয়। চাকের মধ্যে কিছু শ্রমিক থাকে যারা সমাজের এই নিয়ম মানতে চায়না, নিজেদের ডিম পাড়তে চায়, এবং পাড়েও। এই প্রবণতা চলতে দিলে রাণীর শাসনের একনায়কত্বে আঘাত আসবে, তাই একে মেনে নেয়া যায় না। এক্ষেত্রে অন্য সব শ্রমিকরাই আইন মানাবার পুলিশি দায়িত্ব পালন করে। বুঝতে পারা মাত্রই তারা এই অবৈধ ডিমগুলো খেয়ে ফেলে। আইন

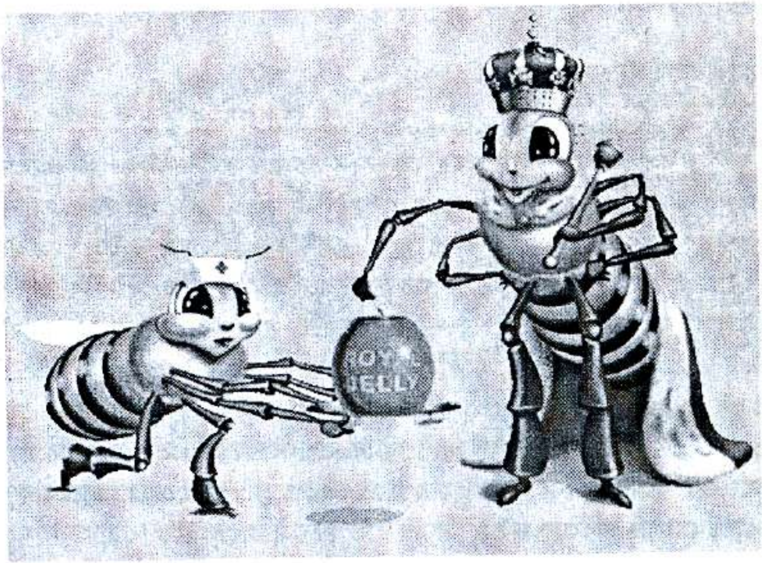

ভঙ্গকারী নিজেরা ছাড়া বাকি সব শ্রমিক সহজাত ভাবেই আইন ভাঙ্গার শুধু বিরূদ্ধেই নয়, কঠোর ভাবে একে দমন করতে তারাই এগিয়ে আসে– এ যেন রাণীরই এক গণ-পুলিশ।

মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়া ইত্যাদি হিমেনোপটরা জাতীয় পতঙ্গের মধ্যে বিবর্তনের ফলে যে কড়াকড়ি সামাজিক নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে লিঙ্গ নির্ধারণের এক অদ্ভুত নিয়ম। সাধারণ প্রাণি জগতে যৌন প্রজননই নিয়ম এবং তাতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের সন্তান জন্মে থাকে। কিন্তু ঐ পতঙ্গ-গোষ্ঠিতে যৌন প্রজনন শুধু স্ত্রী পতঙ্গ সৃষ্টি করে। আর পুরুষ পতঙ্গের জন্ম হয় অযৌন পদ্ধতিতে- মায়ের অনিষিক্ত ডিম থেকে। কাজেই স্ত্রী ও পুরুষের মধ্য একটি বড় ব্যবধান থাকে তাদের জেনেটিক গঠনে। স্ত্রীর কোষে বাবা ও মা এই দুইজন থেকে পাওয়া দুই সেট ক্রোমোজোম থাকে– পরিচিত অনেক প্রাণির মত, যেমন মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যা হয়। এমনটি যথারীতি ঘটলে তাকে বলা হয় ডিপ্লয়েড। কিন্তু মৌমাছির পুরুষের কোষে থাকে শুধু মায়ের এক সেট ক্রোমোজোম, এদের বলা হয় হেপ্লয়েড। স্ত্রী-পতঙ্গগুলোতে দুই সেট ক্রোমোজোমের মধ্যে ইতস্তত জিন অদল-বদলের ফলে তাদের মধ্যে জেনেটিক অনেক বৈচিত্র থাকে কিন্তু পুরুষরা সব হয় শুধু মায়ের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পুরুষ ও স্ত্রী পতঙ্গের মধ্যে এই পার্থক্যের ফলেই অনেক কিছু ঘটে।

আত্মীয়তার সম্পর্কের পরিমাপ

মানুষের পরিবারে ভাই-বোনদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক জেনেটিক পরিমাপে কতটুকু বলা যায়? এটি ঠিক হয় তাদের দু'জনের ক্ষেত্রে প্রকাশিত জিনগুলোর মধ্যে কত অংশ একই হতে পারে তার উপর। একই বাবা-মার জিন তাদের উভয়ের মধ্যে আছে। তবে কারো মধ্যে একটি জিন বাবারটি কার্যকর, আবার কারো মধ্যে সে জিন মায়েরটি কার্যকর হতে পারে বলে দু'জনের জেনেটিক প্রকৃতি মিলবে গড়পড়তা অর্ধেক। পারস্পরিক জেনেটিক সম্পর্কের পরিমাপ যদি r এই ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হয় তা হলে মানুষ ভাই বোনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে r হবে ০.৫ অর্থাৎ অর্ধেক। একই যুক্তিতে মায়ের সঙ্গে সন্তানের এবং বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের r হচ্ছে ০.৫ (যেহেতু বাকী অর্ধেক বাবা-মায়ের অন্য জন থেকে আসে)। সৎ ভাই বা সৎ বোনের মধ্যে r হবে 0.25 (এক চতুর্থাংশ)। এবার মানুষের কথা ছেড়ে মৌমাছি পরিবারে যাই।

সেখানে হেপ্লয়েড পুরুষ সন্তান থাকার কারণে ব্যাপারগুলো যথেষ্ট বদলে যায়। একই সম্পর্ক আমরা দু'পক্ষের কার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখছি তার উপর সম্পর্কের পরিমাপ নির্ভর করবে। মা ও পুরুষ সন্তানের সম্পর্কে সন্তানের দিক থেকে ঠিকই r = 0.5 যথারীতি, কারণ মায়ের কোষের দুই সেট ক্রোমোজোমের মধ্যে তার রয়েছে এক সেট অর্থাৎ অর্ধেক। কিন্তু উল্টো মায়ের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে সন্তানের মধ্যে সক্রিয় সব জিনই মায়ের রয়েছে তাই সেক্ষেত্রে r =1.0। একই রকম অসমান সম্পর্ক কিন্তু ভাইবোনের ক্ষেত্রেও। বোনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে r=0.25, কিন্তু সেটিই ভাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে r = 0.5। মা-মেয়ের সম্পর্ক অবশ্য আমাদের মতই, অসম নয়– দুই জনের দিক থেকেই r =০.৫। দুই বোনের সম্পর্কটিও ব্যতিক্রমী– উভয়ের দিক থেকেই r = 0.75। ওদের প্রত্যেকের কোষে সক্রিয় রয়েছে মায়ের ক্রোমোজোমের অর্ধেক, আর বাবার ক্রোমোজোমের সবগুলোই (যেহেতু ঐ এক সেটই বাবার রয়েছে)। দুই বোনের মধ্যে গড়পড়তা অর্ধেক ক্রোমোজোমে একইগুলো হবে বলে (বাবার ১ আর মায়ের ০.৫ এ দুইয়ের যোগফলের অর্ধেক) দুই বোনের মধ্যে সম্পর্কের পরিমাণ দাঁড়ায় r =0.75। এই অদ্ভুত সম্পর্কটি মৌমাছির জগতে অদ্ভুত সামাজিক নিয়মের মূল কারণ।

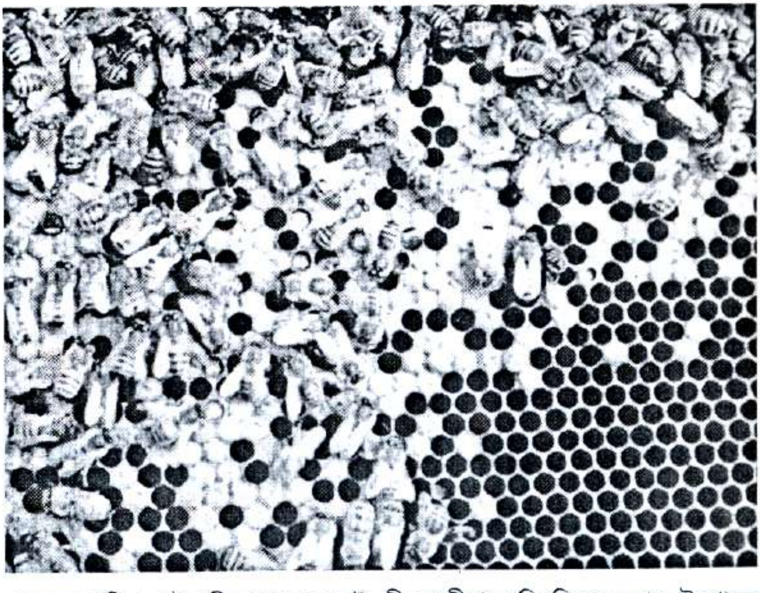

একজন শ্রমিক মৌমাছি (যাদের সবই স্ত্রী জাতীয়) যদি নিজে সন্তান উৎপাদন করে তা হলে সেই সন্তানের সঙ্গে তার জিনের মিল যতখানি হবে (r =0.5), তা

না করে যদি সে মায়ের সন্তান অর্থাৎ বোনদের যত্ন করার দিকে মন দেয় তা হলে নিজের জিন বেশি সংরক্ষণ ও সম্প্রচার করতে পারবে বোনের মাধ্যমে (r =0.75)। এই বিবেচনা থেকেই বিবর্তনের অমোঘ গতি শ্রমিক মৌমাছির জননতন্ত্র অকার্যকর করে রেখে তাকে বরং ফুল টাইম বোনদের অর্থাৎ রাণীর সন্তানদের দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছে। আর রাণীর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাটাও হয়েছে বিশাল। অসংখ্য ডিম পেড়ে মৌচাক সমাজের সকল সন্তানেরই জননী হওয়ার একাধিপত্য সে গ্রহণ করে।

নিয়মের মধ্যে ফাঁকি ও পুলিশি ব্যবস্থা

উপরে যে যৌক্তিক সামাজিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যেও কিন্তু ফাঁকি থাকে। চাকে যে সব পুরুষ থাকে তাদের সবারই মায়ের থেকে পাওয়া এক সেট ক্রোমোজোম থাকলেও মায়ের নিজের দুই সেট থেকে ইতস্তত গঠিত এই সেটে জিনগুলো সবার ক্ষেত্রে এক নয় বলে পরস্পর ভাই হিসাবে এদের শুধু অর্ধেক জিনই মিলে। এদিকে রাণী একাধিক পুরুষ মৌমাছির সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদন করে থাকে। উর্ধ্বে ২০টির মতো পুরুষ এভাবে রাণীর ডিম নিষেকে অংশ নিয়ে থাকে। কাজেই শ্রমিক মৌমাছি যেই আশায় বোনের যত্নে আত্মনিয়োগ করে, সেই আশা প্রায়ই পূরণ হয়না; কারণ এ সব বোনের অধিকাংশই আসলে সৎবোন। সেক্ষেত্রে ০.৭৫ না হয়ে হয় তার অর্ধেক মাত্র ০.৩৫। নিজের সন্তান বাদ দিয়ে (r =0.5), বোনের মাধ্যমে r =0.75 করার সেই আশায় শ্রমিক ঠকে যায়। সৎবোনের মাত্র r=0.35 নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

এই ঠকাটিকে অধিকাংশ শ্রমিক অবশ্য শান্তির খাতিরে মেনে যায়। কিন্তু কোন কোন শ্রমিক এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জিনের সম্প্রচারে আত্মীয়তার সম্পর্কটুকু বাড়াবার জন্য ওরা নিজেরা অবৈধভাবে ডিম পাড়ে। অবশ্য প্রজননতন্ত্র পুরা সক্রিয় নয় বলে পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিষিক্ত ডিম তারা পাড়তে পারে না, অনিষিক্ত ডিমই শুধু পাড়ে। এই অনিষিক্ত ডিম থেকে শুধু পুরুষ সন্তানই জন্মায় - কিন্তু তবুওতো এর মাধ্যমে নিজের জিনের সম্প্রচার হবে সৎবোনের মাধ্যমের চেয়ে ভাল (r =0.375 এর বদলে এক্ষেত্রে r =0.5)। কিন্তু রাণীর রাজত্বের সমাজ এটি মেনে নেবে কেন? তখনই শুরু হয়ে যায় পুলিশি তৎপরতা। অন্যান্য শ্রমিকরাই এই ডিম সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। সব সময় সবাই সতর্ক থাকে তাদেরই কোন কোন শ্রমিক নিজে কোন ডিম পাড়ছে কিনা। প্রশ্ন উঠতে পারে এক্ষেত্রে রাণীর পুলিশি ব্যবস্থা সফল হয় কেন? শ্রমিকরা অন্য শ্রমিকের ডিম নষ্ট করে কেন?

এখানেও সেই r এর পরিমাপের ব্যাপারটিই কাজ করে। ঐ ডিম যে পাড়লো তার সঙ্গে এর থেকে জাত সন্তানের সম্পর্ক হবে r =০.৫। কিন্তু অন্য শ্রমিকের সঙ্গে এর সম্পর্ক সৎ বোনের চেয়েও অনেক কম। কারণ এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৎ বোনের বাচ্চা হিসাবে সৎ বোন-পো মাত্র, যার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক মাত্র r=0.125। কাজেই বিবর্তনগত কারণে কোন শ্রমিক চাইবে না তার বোন (r = 0.75) অথবা সৎবোন (r =0.375) এর স্বার্থ হানি করে এই সৎ-বোন-পো জন্ম নিক (r = 0.125)। সবকিছু যেন চলেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক কত রাখা গেল সেই প্রচেষ্টায়, অর্থাৎ r যথাসম্ভব বড় করার প্রচেষ্টায়।

রাণীর ইঙ্গিতেই সবকিছু

উপরে আত্মীয়তার সম্পর্কের যে হিসাব নিকেশের কথা বলা হলো– সিদ্ধান্ত নেবার জন্য মৌমাছি যে এ সব চিন্তা করে বা অংক করে বের করে তা কিন্তু মোটেই নয়। নিজের জিনের বিস্তৃতির ব্যাপারেও ভাবনা চিন্তা করে সে কাজ করে না। এগুলো তার মধ্যে সহজাত হতে পেরেছে বিবর্তনের একটি সাধারণ মৌলিক নিয়মের ফলে। অতীতে মৌমাছির সব রকম করার সুযোগ ছিল নানা দৈবাৎ কারণে জিনের বিচিত্র পরিবর্তন বা মিউটেশনের ফলে নানা মৌমাছিতে জিনের নানা রকমফের তার প্রজনন অভ্যাস নানা রকম করেছিল। কিন্তু সূক্ষ্ম সেই জিনগুলোই বংশানুক্রমিকভাবে বিস্তৃতি পেয়ে আজকে প্রাধান্য লাভ করেছে যেগুলো অধিক পরিমাণে সম্প্রচার সম্ভব হয়েছে - অর্থাৎ r এর পরিমাণ যেখানে বেশি ছিল। তাই অধিক r এর স্বপক্ষের অভ্যাসগুলোরই এখন জয় জয়কার। অন্য অভ্যাসগুলোর জিন বংশধরদের কাছে যাবার সম্ভাবনা কম ছিল বলে সেগুলোর বিস্তৃতি ধীরে ধীরে কমে গেছে।

এর মধ্যে কিন্তু রাণী কলকাঠি নাড়াতে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। মৌমাছি শ্রমিক যাতে তার সহজাত জেনেটিক অভ্যাসগুলো সহজে পালন করে সে জন্য ক্ষমতার শীর্ষবিন্দু থেকে রাণী ইঙ্গিত দিয়ে রাখে। এই ইঙ্গিতের বার্তাবহ হলো প্রজনন-নিয়ন্ত্রণকারী বিশেষ গন্ধ ফেরোমেন নামের উদ্বায়ী বস্তু ছড়িয়ে রাণী সবার মধ্যে বার্তা সঞ্চারিত করে। ফেরামেনের ঐ বার্তাই শ্রমিক মৌমাছিকে নিজের জরায়ু বন্ধ করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। আর কোন শ্রমিক যদি তা না করে, তা হলে অন্য শ্রমিকদেরকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও উদ্বুদ্ধ করে।

ব্যবস্থাটি বেশ কার্যকরও হয়। এক দিকে অল্প কিছু সংখ্যক শ্রমিক রাণীর ঐ জন্ম-শাসনের নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস দেখায়। অন্য দিকে তাদের বিরুদ্ধে

দাঁড়ায় রাণীর অনুগত পুরো মৌমাছি শ্রমিক সমাজ। একটি গড়পড়তা কলোনীর ত্রিশ হাজার বা তার কাছাকাছি শ্রমিকের মধ্যে মাত্র তিন চারটি অসামাজিক শ্রমিক ওরকমের অবাধ্যতা দেখিয়ে নিজের ডিম পাড়ে এবং সে ডিম থেকে পুরুষ মৌমাছি উৎপাদিত হয় (অনিষিক্ত বলে শুধু পুরুষই জন্মাতে পারে)। এর ফলে কলোনীর পুরুষ-প্রদায়ী সব ডিমের মধ্যে শতকরা সাত ভাগ পর্যন্ত ডিম শ্রমিক থেকে আসতে পারে। কিন্তু অন্যান্য শ্রমিকরা এত তৎপরতার সঙ্গে এ ডিম খেয়ে ফেলে যে কলোনীর পুরুষ মৌমাছিদের মধ্যে হাজারে মাত্র একটি পুরুষ হয় শ্রমিকের সন্তান, বাকি সবাই যথারীতি রাণীর সন্তান।

এত দ্রুত যে অবৈধ ডিমগুলো পুলিশী ব্যবস্থায় ধরা পড়ে যায় তার কারণ এই ডিমের উপর রাণীর ক্যামিকাল স্বাক্ষর থাকেনা। রাণীর সব ডিমে তার বিশেষ ক্যামিকাল পরিচিতি থাকে যা সব শ্রমিকের কাছে স্পষ্ট হয়- এ যেন এক রাজকীয় সীলমোহর। কিন্তু বেচারা শ্রমিকদের ডিমে এটি থাকেনা বলে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যায়। তাছাড়া যে ক'জন অবাধ্য শ্রমিক নিয়ম ভঙ্গ করে তাদের জরায়ুকে সচল করে, সেটি আগেভাগেই তার সহকর্মী অন্য শ্রমিকদের (যারা বোনও বটে) কাছে জানা হয়ে যায়। সেই থেকে বাকি সবাই এদেরকে কড়া পাহারায় শুধু রাখেনা, তাদের সঙ্গে অত্যন্ত মারমুখো আচরণ করতে থাকে। মানুষের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বেশ কিছু কড়া একনায়কতন্ত্র বা পার্টি ডিকটেটরশীপে পুরো সমাজকে যে রকম গুপ্তচর পুলিশে পরিণত করা হতো - এও যেন ঠিক তাই।

যখন নৈরাজ্য নামে

রাণীর শাসনে অবাধ্যের যে কোন স্থান নেই সেটি আমরা দেখলাম। কিন্তু কখনো কখনো এরও ব্যতিক্রম ঘটে। এটি বিশেষ করে ঘটে তখনই, যখন রাণীর মৃত্যুতে হঠাৎ সিংহাসন (রাণীকুটুরী) শূন্য হয়ে পড়ে। তখন কিন্তু জন্মশাসনের ক্ষেত্রেও ঘোরতর নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে। যেই-ফেরোমেনের ফরমান গন্ধবাহিত হয়ে পুরো কলোনীকে শৃঙ্খলায় রাখতো, এখন তার উৎস রাণীর অভাবে সব শ্রমিকই স্বেচ্ছাচারীনী হয়ে উঠতে পারে। সবাই এবার যার যার ডিম পাড়তে লেগে যায়। সাধারণত এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না- নূতন রাণীর দায়িত্বভার গ্রহণের মাধ্যমে এর অবসান হয়। এজন্য যত দ্রুত সম্ভব নূতন রাণীকে অভিষিক্ত করার জন্য মৌমাছি সমাজের মধ্যেই একটি অন্তর্নিহিত তাগিদ থাকে।

তবে একেবারে নৈরাজ্যের দিকে চলে গেছে এমন কলোনীর সন্ধানও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়– যদিও তা অত্যন্ত বিরল। অস্ট্রেলিয়ার কিছু গবেষক একটানা সাত বছর ধরে বার বার মৌমাছি-পালন বিষয়ক ম্যাগাজিনগুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়ে মাত্র

দুটি এরকম কলোনীর সন্ধান পেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন এরকম স্থায়ী নৈরাজ্যের দিকে যাওয়ার ব্যাপারটি একমাত্র মৌমাছিদের জেনেটিক গঠনে এক সঙ্গে দুটি বড় মিউটেশনের (স্থায়ী জেনেটিক পরিবর্তন) ফলেই সম্ভব। একটি জরায়ু বন্ধের জন্য রাণীর ফেরোমেন বার্তা অগ্রাহ্য করার জন্য, অন্যটি রাণীর ক্যামিকাল স্বাক্ষর নকল করে নিজের ডিমকে অন্যান্য শ্রমিকদের কাছ থেকে গোপন করতে পারার জন্য। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন এই দুটি কাজ দুটি পৃথক জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ কারণে দুটিতেই এক সঙ্গে মিউটেশন ঘটার সম্ভাবনা সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবে বিরল হতে বাধ্য। তাঁরা অবশ্য প্রকৃতিতে এরকম নৈরাজ্যময় কলোনী বেশী খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বাদ দিয়ে নিজেরাই বিশেষ প্রজননের মাধ্যমে এরকম জেনেটিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে নিয়েছেন। এবং গবেষণার সুবিধার জন্য সেটি করেছেন বিভিন্ন ভাবে। একদলকে সৃষ্টি করেছেন শ্রমিক হয়েও যারা ডিম পাড়বে কিন্তু সেগুলো অন্যরা ধরে ফেলতে পারবে। আর এক দলকে সৃষ্টি করেছেন যারা ডিম পাড়বেনা, কিন্তু অন্যের ডিম খেয়ে নষ্টও করবেনা। সাধারণত প্রকৃতিতে এক একটি কলোনীতে দু'এক ডজনের বেশি অবাধ্য ডিম-পাড়া শ্রমিক না থাকলেও বিজ্ঞানীরা শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত এ রকম অবাধ্য শ্রমিকে ভর্তি নৈরাজ্যময় কলোনী সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এতে তাঁদের পক্ষে নৈরাজ্য নিয়ে গবেষণা করতে খুব সুবিধা হয়ে গেছে।

দেখা গেছে এ ধরণের কলোনীতে প্রজননের নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে আরো বিভিন্ন রকম অব্যবস্থা। শ্রমিকরা শ্রমিকের কাজ বাদ দিয়ে মা হবার কাজে লেগে যাওয়াতে কলোনীর জরুরী কাজ এখানে শিকেয় ওঠে। কলোনীতে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তাছাড়া যে সব প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে কলোনীর সব কাজ সুচারু-রূপে চলে তাও উল্টাপাল্টা হয়ে যায় পুরুষ লার্ভাকে রাণী তৈরির জন্য নির্বাচন করে তাকে যত্ন আত্তি করে রাণী কুটুরিতে প্রতিপালনের অদ্ভুত ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়! আরো কিছু মজার ব্যাপার এসব নৈরাজ্যের কলোনীতে ঘটতে দেখা যায়। বাইরে থেকে স্বাভাবিক, আইন-মানা শ্রমিকদের এখানে এনে স্থাপিত করলে দেখা যায় তারাও অবাধ্যের মত ডিম পাড়তে আরম্ভ করেছে। এর থেকে বুঝা যায় যে রাণীর শাসন কমজোর হওয়ার অর্থ তার ফেরোমেন এখন শ্রমিকের জরায়ুকে বন্ধ রাখতে সক্রিয় হয়না। আরো অদ্ভুত ঘটনা হলো সাধারণ আইন-মানা কলোনীর রাণীকে সরিয়ে ফেললে তার শ্রমিকরা স্বরাজ পেয়ে ডিম পাড়তে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু ঐ নৈরাজ্যময় কলোনীর রাণীকে সরিয়ে ফেল্‌লে কিন্তু সেখানকার শ্রমিকদের চালাকি আর বজায় থাকে না। এতদিন তাদের ডিমকে রাণীর ডিম বলে চালিয়ে দিয়ে অন্য শ্রমিকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার যে ফাঁকির ব্যবস্থা

থাকতো-কেন জানি রাণী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিমের মধ্যে ঐ সুবিধাটুকুও লোপ পায়। ঐ ডিমকে সাধারণ চাকে স্থানান্তর করলে সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার শ্রমিকরা এগুলো খেয়ে ফেলে।

এখন বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী জিনগুলোকে সনাক্ত করতে। সেটা খুঁজে পেলে আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক জিনের চেহারাটা দেখতে পারব। আর নৈরাজ্য-বিরোধী জিনগুলো হবে সমাজ-কেন্দ্রিক জিন। হয়তো ও সব জিনের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে অন্য প্রাণির এমন কি মানুষের অনুরূপ ব্যক্তি-স্বার্থপর ও সমাজ-নিয়ন্ত্রিত জিনের। সহযোগিতা ও সংঘাতের মূলে জেনেটিক অবদানগুলো সাধারণভাবে উন্মোচিত করতেও হয়তো মৌমাছির এই গবেষণা সহায়ক হবে।

বাইরের হস্তক্ষেপে নৈরাজ্য

এ পর্যন্ত যে নৈরাজ্য দেখেছি সেটি কলোনীর নিজের শ্রমিকদেরই সৃষ্টি। কিন্তু একটি গবেষণায় ধরা পড়েছে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্প্রতি বিশাল এলাকা জুড়ে মৌমাছি কলোনীগুলো ধ্বংস হবার কারণ হয়েছে একের পর এক কলোনীতে ব্যাপকভাবে এমনি নৈরাজ্য দেখা যাওয়াতে। কিন্তু সেটা ঘটেছে বাইরের আর একটি প্রজাতির মৌমাছি গোপনে মূল কলোনীতে এসে শ্রমিক-নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে এগুলো পরজীবির ভূমিকা নেয়, কিন্তু মূল কলোনীর কেউ তা বুঝতে পারে না। আগন্তুক মৌমাছি শ্রমিকরা কোন কাজকর্মে অংশ নেয় না, বরং নিজেরা অনিষিক্ত ডিম পেড়ে কলোনী ভরে ফেলে। এ সব ডিম কেউ নষ্টও করে না, কারণ এমন কিছু ক্যামিকাল চালাকি এর মধ্যে থাকে হয়তো কোন নকল ফেরোমেন যাতে সবার মনে হয় তা স্থানীয় রাণীরই ডিম। সাধারণ কলোনীর শ্রমিকদের অনিষিক্ত ডিমের থেকে এদের ভিন্নতা হলো এগুলো হেপলয়েড পুরুষ জন্ম দেয়না, বরং ডিপ্লয়েড স্ত্রী মৌমাছি জন্ম দেয়– যাতে দুই সেট ক্রোমোজোমেই থাকে ঐ শ্রমিকের হুবহু সব ক্রোমোজোম। অর্থাৎ এর থেকে যে সন্তান হয় তা ঐ আগন্তুক শ্রমিক মায়ের হুবহু জেনেটিক কপি। অসংখ্য ডিম পেড়ে শিগ্‌গির এরা ঐ কলোনী নিজেদের বংশধর দিয়ে ভরে ফেলে, এবং কলোনীগুলোকে নিষ্কর্মা শ্রমিক দিয়ে বোঝাই করে দ্রুত ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। আগন্তুক দল ও তার বংশধররা তখন এই ধ্বংসপ্রাপ্ত কলোনী ছেড়ে আর একটি স্বাভাবিক কলোনীতে চলে যায়, ওটিও ধ্বংস করতে। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বড় অংশের মৌমাছির চাষ এভাবে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যা

যদি প্রশ্ন করা হয় বিংশ শতাব্দীর মানস আর বিংশ শতাব্দীর জীবন উভয়কে সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে জ্ঞানের কোন উন্নতি, তা হলে পদার্থবিদ্যার কথাই বোধ হয় সবার আগে মনে আসবে। বিশেষ করে শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে পদার্থবিদ্যার ধ্যান ধারণায় এমন কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় যাতে মানুষের বিশ্বছবি একেবারেই বদলে যায়। আর এই পরিবর্তনই সুযোগ করে দেয় একদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের পারমাণবিক জগতকে বুঝতে, অন্যদিকে যে মহাবিশ্বের আমরা অংশ সামগ্রিক ভাবে তারও স্বরূপের ব্যাখ্যা পেতে। মহাবিশ্বের নগণ্য একটি কোণায় ছোট একটি গ্রহের সামান্য বাসিন্দা হয়ে এভাবে মৌলিক আর সমগ্রকে অনুধাবন করার মত দুঃসাহসী প্রচেষ্টা নেবার ক্ষমতা আমাদেরকে এনে দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা।

শতাব্দীর একেবারে শুরুর বছর ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্লাঙ্ক একটি উদ্ভট ফলাফলের সংকট থেকে বিকিরণের নিয়মকে রক্ষা করতে গিয়ে আবিস্কার করেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এতে বলা হলো আলো বা এরকম অন্যান্য শক্তির তরঙ্গ যে কোন হারে বিকীর্ণ হতে পারে না। পারে শুধু সুনির্দিষ্ট শক্তির কিছু গুচ্ছে গুচ্ছে যাদের বলা হলো কোয়ান্টাম। এই সুনির্দিষ্ট শক্তিটি হবে তরঙ্গটির কম্পন হারের সমানুপাতিক। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে যে তত্ত্বের জন্ম হলো, শিগ্‌গির অত্যন্ত প্রতিভাবান কয়েকজন পদার্থবিদের হাতে এটি জ্ঞানের রাজ্যে একটি যুগান্তর নিয়ে আসলো। কিন্তু তার আগেই আইনস্টাইন অন্য দিক থেকে মানুষের বিশ্বদৃষ্টিকে একেবারে ভিন্ন কাঠামোতে দাঁড় করালেন তাঁর রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ দিয়ে।

আপেক্ষিক তত্ত্বে দেখা গেল আলোর গতিবেগ একটি ধ্রুবক; এটি পর্যবেক্ষকের বা উৎসের গতিবেগের উপর মোটেই নির্ভর করেনা। এর ফলশ্রুতিতে আলোর বেগের কাছাকাছি চলমান যে কোন জিনিসে অদ্ভুত সব ঘটনা দেখা দেয়। গতির দিকে তার দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়, ভর বেড়ে যায়, এমনকি তার কাছে সময়ের হারটিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ কিনা যেই ভর, এবং সেই সময়কে, চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় অমোঘভাবে অপরিবর্তনীয় মনে করা হয়েছে–তা এখন আপেক্ষিক ব্যাপারে পরিণত হলো। শুধু তাই নয়, বস্তু এবং শক্তি এ দুটো জিনিসের পার্থক্যই আর থাকলোনা; এরা পরস্পরে রূপান্তরিত হওয়া একই সত্তায় পরিণত হলো।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব নামে পরিচিত এই তত্ত্বটি অসুবিধায় পড়লো মহাকর্ষের ব্যাখ্যায় এসে। এক বস্তুর মহাকর্ষ-প্রভাব দূরবর্তী অন্য বস্তুতে তৎক্ষণাৎ, অর্থাৎ অসীম বেগে গিয়ে পৌছায়। অথচ আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুসারে আলোর গতির অতিরিক্ত কোন গতি সম্ভব নয়। আইনস্টাইন এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে উপস্থাপন করলেন আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব। তাঁর তত্ত্বে বলা হলো স্থান আর কালে গড়া চতুর্মাত্রিক যে সত্তা তারই কিছু গুণাগুণের ফলশ্রুতি হলো মহাকর্ষ। বস্তুর ভরের প্রভাবে স্থান-কালের নিরবিচ্ছিন্নতার মধ্যে বক্রতা বা ভাঁজের সৃষ্টি হয়। বস্তু মাত্রই ঐ ভাঁজকে অনুসরণ করে–সেটিই আকর্ষণ হিসাবে প্রতিভাত হয়। জ্যোতিষ্ক তার ভ্রমণ পথে চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের মধ্যে সম্ভব সবচেয়ে হ্রস্বতম পথটি অনুসরণ করে। আমাদের ত্রিমাত্রিক অনুভূতিতে এটিই মহাকর্ষ নির্ধারিত কক্ষপথ।

আপেক্ষিক তত্ত্বের আগে স্থান আর কালকে দুটি নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্তা হিসাবে মনে করা হতো। ১৯১৫ সনে এ তত্ত্ব সম্পূর্ণতা লাভের পর এ ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল। স্থান-কাল এখন বিশ্বের বস্তু আর ঘটনাবলীর প্রভাব থেকে মুক্ত আলাদা কিছু নয়। বিশ্বের বস্তুনিচয়ের বাইরে স্থান বা কালের কোন অস্থিত্ব নাই। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় এগুলো অত্যন্ত বৈপ্লবিক ধারণা, যা মহাবিশ্ব সম্পর্কে এ শতাব্দীতে আমাদেরকে একটি পূর্ণতর উপলব্ধি দিতে সক্ষম হয়েছে।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বকে শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে পূর্ণাঙ্গ কোয়ান্টাম মেকানিক্সে পরিণত করলেন দ্য ব্রগলী, হাইজেনবার্গ, শ্রোয়েডিঙ্গার, ডিরাক প্রমুখ। চিরায়ত বলবিদ্যার তুলনায় এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর ফলে বিজ্ঞানের গাণিতিক নিয়মের অধীনে সকল গতির সকল ফলাফলকে নিঁখুত ঘড়ির মতো হিসাব করার দাবী আর করা গেলনা। কারণ এর মূলে থেকে গেল অনিশ্চয়তার নিয়ম - যেমন একটি কণিকার অবস্থানকে যত নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করতে চাইবো, তার বেগ নির্ণয়টি ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে; আবার বেগকে নিখুঁত করতে

চাইলে অবস্থানটি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এতে কণিকার আর সুনির্দিষ্ট পরিমাপযোগ্য একটি অবস্থান বা একটি বেগ থাকলো না, যা থাকলো তা হলো –'একটি কোয়ান্টাম অবস্থা' যা কিনা অবস্থান আর বেগের একটি সম্মিলিত রূপ– যার মধ্যে ঐ অনিশ্চয়তাটুকু থেকে যায়।

সত্যিকার ফলাফলটি পরিণত হয় একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক ব্যাপাওে–অনেকগুলো কণিকা নিয়ে কাজ করলে তার কতগুলোকে কি অবস্থায় পাওয়ার সম্ভাবনা সেটি নিয়ে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স কণিকা আর তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য আর তেমন কিছু থাকলো না। এর যে গণিত তা কণিকাকে তরঙ্গ হিসাবে এবং তরঙ্গকে কণিকা হিসাবে যে কোন ভাবে দেখতে পারে।

ইতিমধ্যে এটি পদার্থবিদদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে হাজার বছর ধরে পরমাণু সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তার সেই অবিচ্ছেদ্যতার গুণটি পুরো সত্য নয়, পরমাণু নিজেও আরো ছোট কণিকা দিয়ে গঠিত। এবার বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের সহায়তা নিয়ে পরমাণুর গঠনেরও একটি ছবি অবশেষে পাওয়া গেলো। আমরা পরমাণু শুধু নয়–তার অংশগুলোকেও বুঝতে সক্ষম হলাম। কণিকাকে তরঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করার ফলশ্রুতি হিসাবে পরমাণুর গঠনের মধ্যে এর কণিকাগুলোর সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মসিদ্ধ শক্তি অবস্থা চিহ্নিত করা সম্ভব হলো, শুধু সেই অবস্থাতে এরা থাকতে পারবে–অন্য কোন মাঝামাঝি অবস্থায় নয়।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স পদার্থবিদ্যার বহুদিনের লালিত গর্ব-নিশ্চয়তাকে-বিসর্জন দিয়ে কারো কারো মর্মবেদনার কারণ হলো বটে, কিন্তু অসংখ্য পরীক্ষণ-ফলাফলের নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী আর ব্যাখ্যা দিয়ে এটি শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যার সকল সমস্যার ক্ষেত্রে রীতিমত দিগ্বিজয় করলো। পরমাণু, অণু, রাসায়নিক বন্ধন, বিক্রিয়া-সব কিছুর গাণিতিক ব্যাখ্যা এতে ধরা পড়লো। পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াসের রহস্যও উদ্ঘাটিত হলো। কণিকাসমূহের মধ্যেও আবিষ্কৃত হলো আরো জটিল জগত। কণিকা বিদ্যা নিজেও একটি বিস্তৃত বিজ্ঞানে পরিণত হলো - যাতে স্থায়ী কণিকা ছাড়াও আরো বিচিত্র অস্থায়ী কণিকা আবিষ্কৃত হলো। ইলেকট্রন ছাড়া যে প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা রয়েছে দেখা গেলো তারা আবার গঠিত আরো মৌলিক তিন রকমের কোয়ার্ক কণিকার দ্বারা। বস্তু কণিকা, শক্তি-কণিকার সমন্বয়ে কণিকাগুলো শ্রেণীবদ্ধ হলো তাদের নানা গুণের বিচারে। এমনি একটি গুণ হলো এদের সংখ্যায়ন। যেগুলো বসুর সংখ্যায়ন মেনে চলে সেগুলোর নাম হলো বোসন, আর যেগুলো ফার্মির সংখ্যায়ন সেগুলো ফার্মিয়ন। এই বসু আর কেউ নন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯২৪ সনে কার্জন হলের এই বিভাগ থেকে তাঁর গবেষণা

প্রবন্ধ কোয়ান্টাম তত্ত্বের সেই স্বর্ণযুগের একটি প্রধান সৃষ্টিকার হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর চিন্তা-বিপ্লবে সত্যেন্দ্রনাথ বসু আমাদের দেশের নাম স্থায়ীভাবে এঁকে দিয়ে গেছেন।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনেকগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে আমাদের সার্বিক জ্ঞানের সীমাকে অনেকদূর বাড়িয়ে দিল। এর সঙ্গে যুক্ত করা হলো শতাব্দীর অন্য বৈপ্লবিক ধারণা আপেক্ষিক তত্ত্বের ফলাফলগুলোকে। এসব তাত্ত্বিক সাফল্য শিগ্‌গির অতি বড় মাপের সব প্রায়োগিক সাফল্যেরও জন্ম দিল। শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে এমনি একটি নাটকীয় সাফল্য ঘটলো ফিশন বিক্রিয়ায় পরমাণু বিদীর্ণ করে পরমাণু-কেন্দ্রের কণিকাগুলোর বন্ধনে আবদ্ধ শক্তির বাস্তব উৎসারণের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে নিউক্লিয়ার চুল্লীর মাধ্যমে এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরমাণু-বোমার মাধ্যমে। উভয়টিই এসেছিল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে, অত্যন্ত হৃদয়বিদারী ধ্বংসযজ্ঞেই যার প্রকাশ ঘটেছিল। পদার্থবিদ্যা যেন এখানে এসে একটি বড় ধাক্কা খেলো, ওপেনহাইমার প্রমুখ অনেক সচেতন পদার্থবিদ যাঁরা এর সৃষ্টিকার ছিলেন, তাঁরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন তাঁদের সাফল্যের নৈতিকতা নিয়ে। এটি বিজ্ঞানীদের এবং সমগ্র সচেতন মানবজাতির চিন্তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে বৈ কি। পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতিতেও এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার শক্তি উৎপাদনের কল্যাণী ভূমিকাও এখন প্রশ্নের সম্মুখীন এর পারিবেশিক ও নিরাপত্তা জনিত ঝুঁকির কারণে। কিন্তু একই সঙ্গে আর একটি স্বপ্ন পদার্থবিদদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা হলো নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব করে সাধারণ পানি থেকে অফুরন্ত শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। এতে একাধিক হালকা পরমাণুকে একীভূত করে অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণু তৈরীর মাধ্যমে শক্তির উৎসারণ ঘটানো হয়। একে সম্ভব করে তোলার জন্য অতি উচ্চ উত্তাপে পদার্থের যে প্লাজমা অবস্থা তার নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকখানি অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে চূড়ান্ত লক্ষ্যটি এই শতাব্দীতে আর অর্জিত হলোনা। ইতিমধ্যে হাইড্রোজেন বোমাতে অনিয়ন্ত্রিত ফিউশন সম্ভব হয়েছে। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের শক্তির উৎস হিসাবে ফিউশন বিক্রিয়ার ভূমিকা উদ্ঘাটিত হয়েছে।

তবে আর একটি স্বপ্ন, আর একটি লক্ষ্য এই শতাব্দী শেষ হবার বহু আগেই অর্জিত হয়েছে - তা হলো পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর সীমা আর বাঁধনকে অতিক্রম করে চাঁদে পদার্পণ করে এসেছে। মহাকাশ অভিযানের পুরো কৃতিত্বটি যদিও পদার্থবিদ্যা একা দাবী করতে পারেনা, তবুও বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যার অগ্রযাত্রাই নানা

ভাবে একে সম্ভব করে তুলেছে। যেই অবদান গুলো এত বড় অভিযান সম্ভব করেছে - তারই কোন কোনটি আবার আমাদের দৈনন্দিন জীবনকেও দিয়েছে অকল্পনীয় সমৃদ্ধি।

এর জন্য আমাদের তাকাতে হবে সলিড স্টেট পদার্থবিদ্যা, বস্তুবিদ্যা, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদির অগ্রযাত্রার দিকে। পদার্থবিদ্যার, বিশেষ করে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সফলতম অবদানগুলোর মধ্যে এগুলো গণ্য– প্রায়োগিক দিকে লক্ষ্য করলেতো বটেই। রেডিও-বিজ্ঞান শতাব্দীর শুরুতেই বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের ক্ষেত্রে নূতন যুগের সূচনা করেছিল। এরই ধারাবাহিকতা পরে টেলিভিশন এবং রাডারে রূপ পেয়েছে। পদার্থবিদ্যার সাফল্যকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানোতে এদের সাফল্য যাদুর মত কাজ করছে। বেতার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্য আদান প্রদান সমগ্র পৃথিবীকে আজ এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রয়োগ করে কঠিন পদার্থের বিভিন্ন গুণাগুণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে সেমিকন্ডাক্টর অর্থাৎ আধা-পরিবাহী বস্তুগুলোর অভাবনীয় সম্ভাবনা উন্মোচন একটি বড় সাফল্য। এরই ফলে ১৯৪৬ সালে উদ্ভাবিত হয়েছে ট্রানজিষ্টর - যা ইলেকট্রনিক্সের জগতকে কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ বদলে দিল। এর ফলেই সম্ভব হয়েছে ক্ষুদ্রায়িত ইলেকট্রনিক্স, ইনটেগ্রেটেড সার্কিট, বিচিত্র রকমের ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং আজকের ইলেকট্রনিক ও কম্পিউটার বিপ্লব - যা মানুষের জীবনটাকেই ভিন্ন রূপ দিয়েছে। শতাব্দীর উত্তরণে মানুষের সামনে যে দিনের হাতছানি, তাতেও বড় ভূমিকা থাকবে এরই। মানুষের সক্ষমতাকে, তার জীবনকে এতখানি বিস্তৃত করা সম্ভব হলো, তার সব কিছুর আগে পদার্থবিদ্যাকে বুঝতে হয়েছে কিভাবে সিলিকনের মত সাধারণ বস্তুকে বিশেষ যত্নে কেলাসিত করে, তাতে অল্প কিছু বিজাতীয় পরমাণুর নিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, এর মধ্যে অসাধারণ গুণ আরোপ করা সম্ভব। অতি সামান্য পরিমাণ বস্তু এভাবে জটিল ইলেকট্রনিক সিগন্যালের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে পারে। ছোট্ট এবং পাতলা সিলিকন চিপের মাধ্যমে খচিত হতে পারে অনেক জটিল কর্ম সম্পাদনের জন্য অসংখ্য বিদ্যুৎ বর্তনী।

কোন কোন ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক সাফল্যের অনেক পরে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বড় মাপের প্রায়োগিক সাফল্যের। এমনটি হয়েছে সুপারকন্ডাক্টিভিটি বা অতিপরিবাহিতার ক্ষেত্রে। শতাব্দীর শুরুর দিকে কেমারলিং ওনেস আবিষ্কার করেছিলেন কিভাবে কোন কোন বস্তু অতি নিম্ন তাপমাত্রায় একটি পর্যায়ে পৌঁছামাত্র বাধাহীন ভাবে বিদ্যুৎ পরিবহনে সক্ষম হয়ে পড়ে। পদার্থবিদ্যা পরে এই রহস্যের সমাধান করেছে সুপারকন্ডাক্টিভিটির বি,সি,এস তত্ত্বের মাধ্যমে। কিন্তু

১৯৮৬ সালে উচ্চ-উত্তাপ-সুপারকন্ডাক্টিভিটি আবিষ্কারের ফলে এখন সম্পূর্ণ নূতন ভাবে বিষয়টিতে জোয়ার এসেছে। এর কারণ এখন খুব কম উত্তাপে না গিয়েই এই অদ্ভুত গুণের সুযোগ নেয়া যাচ্ছে। ফলে বিনা অপচয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন, অতি শক্তিশালী চুম্বকের সাহায্যে শূন্যে ভাসানো ট্রেন চালানো, ইত্যাদি অভাবনীয় প্রয়োগ আমাদের সক্ষমতার মধ্যে চলে এসেছে।

এই শতাব্দীতে আলোকবিদ্যার উপর যে কাজ হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হলো লেজার। কথাটি কিছু আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত যার পুরো মানে হলো উত্তেজন ক্রিয়ায় বিকিরণ উৎসারণের মাধ্যমে আলোর বিবর্ধন। আলোর কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক অনুধাবনের সুযোগ নিয়ে এখানে আলোর সব তরঙ্গকে একই তালে একই লয়ে চলতে বাধ্য করে একটি সুসংহত রশ্মিতে পরিণত করা হয়। ফলে তার তীব্রতা, না ছড়িয়ে পড়ে দীর্ঘপথ অতিক্রমনের ক্ষমতা অভাবনীয় রকম বৃদ্ধি পায়। এই নূতন ধরনের আলোর এখন অসংখ্য ব্যবহার। টেলিযোগাযোগ থেকে চিকিৎসায় অস্ত্রোপচার, কোথাও একে ছাড়া আজ চলছেনা। হলোগ্রাফির মাধ্যমে এটি সৃষ্টি করেছে ত্রিমাত্রিক স্থানে ইমেজ সৃষ্টির এক চমকপ্রদ ব্যবস্থা। এতে ইমেজটিকে নানা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঘুরে ঘুরে দেখানো সম্ভব।

অদৃশ্যকে দেখানোর জন্য পদার্থবিদদের যে শত শত বছরের প্রচেষ্টা, বিংশ শতাব্দীর কিছু আবিস্কার ও উদ্ভাবন তাকে অভাবনীয় পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে আলোর বদলে ইলেকট্রনকে ব্যবহার করা হলো, কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের হিসাবে এও তো এক রকম তরঙ্গই অথচ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক ছোট হওয়াতে আলোর তুলনায় সূক্ষ্ম জিনিস দৃশ্যমান করার ক্ষমতা এর অনেক বেশী। এই মাইক্রোস্কোপ উন্নয়নের এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছলো যেখানে একটি পরমাণুকে পর্যন্ত আলাদা করে দেখা সম্ভব। কেলাসিত বস্তুর অণুগুলো, কোন বিন্যাসে কত দূরে দূরে রয়েছে তার নিঁখুত ছবি ও পরিমাপ পাওয়া সম্ভব হলো এক্সরের নূতন ধরনের ব্যবহারে। অদৃশ্যকে পরিমাপের এই মৌলিক কাজটি সম্ভব না হলে আজ যে আমরা ডি,এন এর অথবা প্রোটিনের গঠন বুঝার মাধ্যমে জীবন রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছি তা সম্ভব হতোনা।

ইমেজিং এর ক্ষেত্রে যে বিচিত্র ব্যবস্থা পদার্থবিদ্যা এ শতাব্দীতে এনে দিয়েছে তা চিকিৎসাবিদ্যাকে, বিশেষ করে রোগ নির্ণয়ের ধরনকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। শব্দ তরঙ্গ দিয়ে আলট্রাসনোগ্রাফি, তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার, ক্যাট স্ক্যান এগুলোতো আজ প্রায় গতানুগতিকভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৪৫ সালে পদার্থবিদরা উদ্ভাবন করেছিলেন নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স বা এন.এম.আর। শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে কোন বস্তুকে রাখলে এর মধ্যে

থাকা কোন কোন মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ঘূর্ণন প্রভাবিত হয়। এ অবস্থায় একটি রেডিও তরঙ্গ এর মধ্য দিয়ে চালনা করলে তা পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে এসব নিউক্লিয়াসকে বিশেষ বিশেষ দিকাভিমূখে নিয়ে যায়। পরে তরঙ্গ বন্ধ করে দিলে ওসব নিউক্লিয়াস থেকে বিকীর্ণ শক্তির বিশ্লেষণ বস্তুটির আনবিক গঠনের সূক্ষ্ম ছবি দিতে সমর্থ হয়। বস্তুর রাসায়নিক গঠন জানার ক্ষেত্রে যেমন এই পদ্ধতি অনন্য, তেমনি রোগ নির্ণয় মানব দেহের কোষ-কলার পরিস্থিতি জানতেও এর জুড়ি নাই।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সে বস্তু-কণিকা সমূহের পরস্পর ক্রিয়া নির্ভর করে তাদের একে অপরের সঙ্গে অন্য একরকম কণিকার লেনদেনের মাধ্যমে। এই শেষোক্ত কণিকাগুলোকে বলা যায় বল-বাহক কণিকা। সবক্ষেত্রে বস্তু কণিকার মত বাস্ত বক্ষেত্রে সরাসরি উদঘাটন না করা গেলেও তাদের অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে টের পাওয়া যায়। যেই বলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার জোর এবং কি ধরনের বস্তু-কণিকার সাথে তার কারবার সেই অনুসারে বল-বাহক কণিকাগুলো চার ভাগে বিভক্ত। মহাকর্ষ বলের জন্য বাহক-কণিকা হচ্ছে গ্র্যাভিটন। খুব দুর্বল বিধায় বাস্তবক্ষেত্রে এর সন্ধান এখনো মেলেনি। বৈদ্যুতিক চার্জধারী কণিকাগুলোর মধ্যে কাজ করে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল তা সংঘটিত হয় বাহক-কণিকা ফোটনের লেনদেনের মাধ্যমে। ফোটনকে বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা আলোক তরঙ্গ হিসাবেও দেখি। নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'দুর্বল নিউক্লিয়ার বল' ইলেকট্রন আর কোয়ার্কের মধ্যে কাজ করে। ১৯৬৭ সালে আবদুস সালাম আর ভাইনবার্গের আবিষ্কারের আগে একে ভাল ক'রে বোঝা যেতনা। সালাম আর ভাইনবার্গ দেখালেন দুর্বল নিউক্লিয়ার বল কাজ করে ফোটনের সদৃশ তিনটি বল-বাহক কণিকার মাধ্যমে যেগুলোকে তাঁরা নাম দিলেন 'ভারী ভেক্টর বোসন'। ফোটনের মত এরা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সংখ্যায়ন মেনে চলে। তাঁদের কথা হলো অনেক উচ্চ শক্তির ক্ষেত্রে এসে ফোটন আর নব আবিষ্কৃত এই আরো তিনটি বোসনের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য থাকেনা। এরা একই রকম আচরণ করে। অর্থাৎ কিনা ফোটন বাহিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল আর ভারী ভেক্টও বোসন বাহিত নিউক্লিয়ার দুর্বল বিক্রিয়া এদেরকে একই তত্ত্বে একীভূত করলেন তাঁরা।

একীভূত করার কাজে আরো কিছু সাফল্য আসলো চতুর্থ প্রকারের বলটি অর্থাৎ নিউক্লিয়ার সবল বলকে এর সঙ্গে যোগ করার চেষ্টার মাধ্যমে। এই বলের ক্ষেত্রে বস্তু-কণিকাগুলো হলো কোয়ার্ক, আর বল-বাহক কণিকা হলো গ্লুয়ন। সবল নিউক্লিয়ার বলই নিউক্লিয়াসের কণিকাগুলোকে শক্তিশালী বন্ধনে ধরে রাখে এবং নিউক্লিয়াস বিদীর্ণ করলে পরমাণু শক্তির উৎসারণ ঘটায়। কোয়ার্ক ও গ্লুয়নের

সমূহের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোনটি একা থাকতে পারে না। কোয়ার্কের নানা সমন্বয়ে প্রোটন, নিউট্রন ও অস্থায়ী কণিকা মেসন রূপে ; এবং গ্লুয়নের নানা সমন্বয়ে তাদের পেতে হয়। বর্তমান প্রচেষ্টাগুলো সফল হলে একটি মহা-একীভূত তত্ত্ব দেখাতে পারবে যে আরো উচ্চ শক্তিতে গিয়ে বিদ্যুৎ চৌম্বক, নিউক্লিয়ার দুর্বল এবং নিউক্লিয়ার সবল সব একই সূত্রে গাঁথা। কণিকা পদার্থবিদদের অনেকে এখন বস্তু ও শক্তির মৌলিক উপাদানকে ঠিক কণিকার আকারে না দেখে এক ধরনের সূতার (ষ্ট্রিং) আংটার আকারে দেখছেন। এই ষ্ট্রিং থিওরীতে নানা কণিকার প্রকাশ ঘটছে এই সূতার কম্পন বৈচিত্র্যের মাধ্যমে - কোন কম্পন দিচ্ছে কোয়ার্ক, কোন কম্পন ফোটন ইত্যাদি– যেমন করে বেহালার একই তারে নানা কম্পনে নানা সুর উঠতে পারে। অবশ্য ষ্ট্রিং থিওরীর এই সূতার কম্পন আমাদের পরিচিত স্থান কালের তিন মাত্রায় নয়- আরো অনেক বেশী গাণিতিক মাত্রায়– অন্তত দশটি মাত্রায়। বাড়তি মাত্রাগুলো সবকিছুর রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজন, তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলো লুক্কায়িত হয়ে শুধু স্থান-কালের তিন মাত্রাতে প্রতিভাত হতে পারে। ষ্ট্রিং থিওরীর কোন পরীক্ষণ-প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। যদি তা যায়, তা হলে সেটি হবে পদার্থবিদ্যার একীভূত তত্ত্বের জন্য একটি বিশাল সাফল্য।

পদার্থবিদরা এখন পেতে চাচ্ছে জ্যোর্তিবিজ্ঞানীদের নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ফলাফলগুলোকে একই সঙ্গে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে উপস্থাপনের সুযোগ। এই উপস্থাপনের মধ্যে এখনো বিংশ শতাব্দীর বিরাট কীর্তি কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে সমন্বিত করা হয়নি, এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে অনিশ্চয়তার নীতিটি অঙ্গীভূত হয়নি। এতে অবশ্য মহাজাগতিক বিদ্যার বিকাশে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি কারণ আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসা মহাকর্ষ বল মূলত দুর্বল বল, কোয়ান্টাম মেকানিক্স তাতে খুব একটা ইতর বিশেষ সৃষ্টি করবেনা। কিন্তু একই বিশ্ব ছবি আমাদেরকে বলে দিচ্ছে দুটি বিশেষ পরিস্থিতির কথা। একটি হলো বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম কয়েকমুহূর্তে– তথাকথিত মহাবিস্ফোরণ বা বিগব্যাং এর সময়টিতে। অত্যন্ত ঘনীভূত থাকা বস্তুতে যে ধরনের মহাকর্ষ ক্ষেত্র তাতে কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনিবার্য। তেমনি আর একটি বিশেষ পরিস্থিতি হলো নক্ষত্রের একটি পরিণতি ব্ল্যাক হোল। এখানে নক্ষত্রের বস্তুপুঞ্জ এমন ভাবে চুপসে যায় এবং মহাকর্ষ এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে কোন বিকিরণ যার আওতা ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারেনা– ফলে এটি পরিণত হয় ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ বিবরে। এই উভয় ক্ষেত্রের ঘটনাবলীর উপর পদার্থবিদরা এখন তাঁদের অনন্য তত্ত্বগুলোকে সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন এবং বেশ খানিকটা সফলও হয়েছেন।

হাজার বছর ধরে প্রাকৃতিক দার্শনিক বলে পরিচিত পদার্থবিদরা যে ভাবে বস্তু ও শক্তিতে গড়া বিশ্বকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, গ্যালিলিও ও নিউটনের মতো ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানীরা সেই বিজ্ঞানের মধ্যে একটি অমোঘ গাণিতিক অনিবার্যতা এনে দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদরা তাঁদের বৈপ্লবিক আবিষ্কারগুলোর মাধ্যমে একে মানব-মানসের কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে গিয়েছেন। নিজেদেরকে আমরা নাম দিয়েছি হোমো সেপিয়েন্স- জ্ঞানী মানুষ। ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণিকা থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিকাশ পর্যন্ত সব কিছুর যৌক্তিক ও প্রামাণিক ব্যাখ্যা সম্ভব করে তুলে এবং তার অনেক ফসল দৈনন্দিন জীবনে ভোগ করতে দিয়ে বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ আমাদেরকে সার্থকনামা করে তুলতে বড় অবদান রেখেছেন।

সেই বেড়াল কি বেঁচে আছে ?

থলের বেড়াল নয়, বাক্সের বেড়ালটি এবার বের হলেও হতে পারে। যদিও এও এক গল্পের বেড়াল, সত্তর বছর আগে পদার্থবিদ শ্রোয়েডিংগার যাকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তবুও বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার জন্য এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বেড়ালটি গল্পে আছে, এ কথাটিও ঠিক হলো না। বলতে হবে এটি আছে কল্পনার এক্সপেরিমেন্টে। সত্যি সত্যি যন্ত্রপাতি দিয়ে ল্যাবোরেটরিতে করার বদলে বিজ্ঞানীরা কল্পনায় মনে মনে এই এক্সপেরিমেণ্ট করেন-অবশ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে। শ্রোয়েডিংগারের সেই কল্পনার এক্সপেরিমেন্টে একটি বেড়াল রয়েছে বাক্সের মধ্যে। কিন্তু বেড়ালটি বেঁচে আছে কি মরে গেছে এ প্রশ্নের সাধারণ কোন উত্তর নাই। কারণ বৈজ্ঞানিক কারণেই শ্রোয়েডিংগারকে বলতে হচ্ছে বেড়ালটি বেঁচেও আছে আবার মরেও গেছে– এই দুই অবস্থাই তার মধ্যে একই সঙ্গে বর্তমান!

শ্রোয়েডিংগারের সংকট

বেড়ালের বাঁচা মরা নিয়ে এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কারণ হলো আধুনিক পদার্থবিদ্যার কেন্দ্রীয় তত্ত্ব কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এর নিয়ম অনুযায়ী একই বস্তু দুই রকম অবস্থার মধ্যে একটি উপরিপাতনে থাকতে পারে। অর্থাৎ কিনা সে বস্তুর অবস্থান, গতি ইত্যাদির বর্ণনা একই সঙ্গে বিভিন্ন হতে পারে। একটি অর্ধ-স্বচ্ছ অর্ধ-প্রতিফলক– এ রকম কাচের উপর তেরচা করে আলোর রশ্মি ফেললে কিছু আলো এর মধ্য দিয়ে চলে যায়, আর কিছু আলো প্রতিফলিত হয়। একে বলা যায় রশ্মি-বিভাজক। ঐ রশ্মিতে যদি আলোর একটি মাত্র কণিকা (ফোটন) থাকে যার বিভাজন সম্ভব নয়, তা হলে ফোটনটি হয় কাচের মধ্য দিয়ে যাবে, নইলে প্রতিফলিত হবে। এখন শ্রোয়েডিংগারের কল্পনার এক্সপেরিমেন্টে বাক্সের বেড়ালের

সঙ্গে আরো কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। ওতে বেড়ালের মাথা বরাবর তাক করা আছে একটি গুলিভরা পিস্তল। আলোর একটি ফোটন বাক্সে গেলেই এর ট্রিগার কাজ করবে এবং গুলি বেরিয়ে বিড়াল মারা যাবে। সেই রশ্মি বিভাজক কাচটি এমনভাবে বসানো হয়েছে যে ফোটনটি কাচের মধ্য দিয়ে চলে গেলে সোজা বেড়ালের বাক্সে ঢুকবে আর বেড়ালটি গুলি খেয়ে মারা যাবে। আর যদি প্রতিফলিত হয়, তাহলে অন্যদিকে ফোটন চলে যাবে বলে বেড়াল মরবেনা। প্রশ্ন

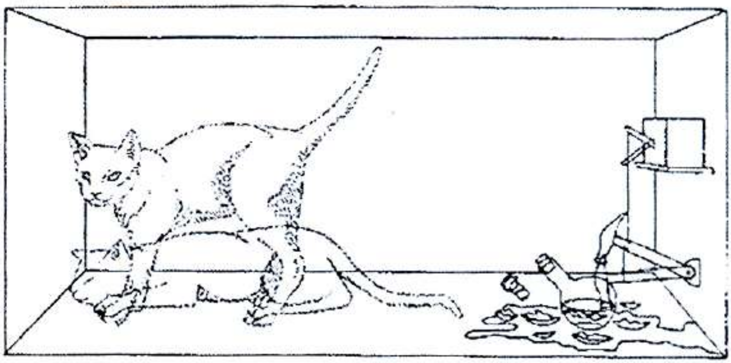

হলো বেড়াল কি বেঁচে আছে? কোয়ান্টাম তত্ত্ব কিন্তু আসলে বলে না যে ফোটন হয় ভেতর দিয়ে গেছে নয় প্রতিফলিত হয়েছে। এ তত্ত্বের কাছে ঘটনাটি– হয় এটা নয় ওটা– এরকম ব্যাপার নয়, বরং উভয়েরই একের সঙ্গে অপরের জড়ানো ব্যাপার। অর্থাৎ এই দুইই একই সঙ্গে ঘটছে। পদার্থবিদ একে বলেন দুই অবস্থার সম্ভাবনা-তরঙ্গ উপরিপাতিত অবস্থায় রয়েছে– অর্থাৎ কিনা বেড়াল মরেও গেছে আবার বেঁচেও আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সিষ্টেমের বাইরে থেকে পর্য্যবেক্ষণ করে বাক্স খুলে বা অন্য কোন ভাবে কেউ বেড়ালের বাঁচা মরা সম্পর্কে জানতে পারছে, ততক্ষণ বিজ্ঞানের এটিই একমাত্র বক্তব্য। যে মুহূর্তে জানা যাবে, তখন ঐ পর্য্যবেক্ষণের ক্রিয়াটিই উপরিপাতনের অবসান ঘটাবে– বেড়াল তখন একটি মাত্র অবস্থায় থাকবে–হয় বাঁচার অবস্থায় নইলে মরার অবস্থায়। তার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত কোন এক অবস্থায় আছে এমনটি বলা যাবেনা, কারণ তার বর্ণনা দেয়ার দায়িত্ব তখন পর্যন্ত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আওতায়, সাধারণ বুদ্ধির নয়। এটিই শ্রোয়েডিংগারের বিখ্যাত সংকট– কোয়ান্টাম মেকানিক্স যাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। অথচ কোয়ান্টাম মেকানিক্স যে খাঁটি তত্ত্ব তা অসংখ্যবার বহুভাবে নিশ্চিত হয়ে একেবারেই সন্দেহাতীত। শ্রোয়েডিংগার নিজেও কোয়ান্টাম

মেকানিক্সের একজন স্থপতি। এরকম অবশ্যম্ভাবী একটি ব্যাপারে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি সায় দিতে না পারার যে সংকট সেটি নাটকীয়ভাবে দেখাবার জন্যই তিনি তাঁর বেড়ালের অবতারণা করেছেন।

সাধারণ বুদ্ধির দ্বিধা

স্পষ্টতই পুরো ব্যাপারটি সাধারণ বুদ্ধিতে মানা যায় না। শুধু এক ফোটনের বিশেষ ক্ষেত্রেই নয়। সার্বিক ভাবে সবকিছুতে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এভাবেই কথা বলে। যেমন একটি চাবির গোছা আমি হারিয়ে ফেল্লাম। সেটি আমি খুঁজে না পেতে পারি আপাতত, কিন্তু কোথাও না কোথাও যে একটি মাত্র জায়গায় সেটি আছে এ কথা বলতে তো দ্বিধা হবার কথা নয়। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলবে যতক্ষণ তুমি ওটা খুঁজে না পাচ্ছ ততক্ষণ এর অবস্থান একাধিক সম্ভাব্য জায়গায় একই সঙ্গে উপরিপাতিত হয়ে রয়েছে। সাধারণ বুদ্ধির ব্যতিক্রমী হওয়াতে শুরুতে পদার্থবিদের কাছেও এতে খটকা লাগে বৈকি। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাফল্য ততই অকাট্য যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মেনে নিতে হয় যে বিশ্ব-নিয়মটি এরকমই– তা আমাদের কাছে অদ্ভুত যতই লাগুক না কেন। অবশ্য এর মধ্যেও অল্প কিছু পদার্থবিদ ব্যাপারটিতে ঠিক সায় দিতে পারছেন না। তাঁরা বলছেন এখনো সম্ভব না হলেও এর এমন ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই দেয়া যাবে– যেটি সাধারণ বুদ্ধির অতীত হবে না। সে রকম একজন পদার্থবিদ হলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রোজার পেনরোজ।

সংকট পরিত্রাণে পেনরোজ

এ সম্পর্কে পেনরোজের নিজের ব্যাখ্যা একটি রয়েছে। এটি বুঝতে গেলে একদিকে আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও অন্য দিকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার তত্ত্বের অবতারণা করতে হবে। আইনষ্টাইন দেখিয়েছেন মহাকর্ষ কি ভাবে স্থান-কালের চতুর্মাত্রিক বিস্তারের মধ্যে বক্রতার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবীর ভর স্থান-কালে কিছুটা টোল খাওয়ার মত বক্রতা সৃষ্টি করে। চাঁদ এই বক্রতা অনুসরণ করতে গিয়েই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, অনেকটা যেমনভাবে কাৎ করা রাস্তা ধরে চলতে গিয়ে গাড়িকে ঘুরতে হয়। কোন বস্তুর ভর কম হলে এর দ্বারা সৃষ্ট স্থান-কালের বক্রতাও কম হবে, যেমন পরমাণুর ক্ষেত্রে এর অস্তিত্ব বোঝাই দায় হবে। পেনরোজের মতে কোন বস্তুর অবস্থা যখন দুটি অবস্থার উপরিপাতন হিসাবে আসে তখন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থান-কালের বক্রতাও দুটি বক্রতার উপরিপাতন হিসাবে দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে আশপাশের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে এই বস্তুটির মহাকর্ষ শক্তি দুই ভিন্ন অবস্থায় কিছুটা

ভিন্ন পরিমাণের হবে। এর মানে দাঁড়ায় অবস্থার উপরিপাতনের ফলে পুরো ব্যবস্থাটির মধ্যে শক্তির ক্ষেত্রে একটি অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, যে কারণে শক্তির পরিমাণকে সুনির্দিষ্ট করা যায়না।

এই অনিশ্চয়তার বিষয়টিতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। এ রকম অনিশ্চয়তাকে বিখ্যাত পদার্থবিদ হাইজেনবার্গ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি মৌলিক অনুসঙ্গ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন সে বহুদিন হয়ে গেল। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি অনুসারে শক্তির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা যত বড় হবে, অনিশ্চয়তা প্রদায়ী ব্যাপারটি তত স্বল্পস্থায়ী হবে। শক্তির অনিশ্চয়তার পরিমাণ আর এর স্থায়ীত্বকাল এ দুইয়ের গুণফল একটি ধ্রুবকের সমান। অর্থাৎ এদের একটি যত বড় হবে, অন্যটি তত ছোট হবে।

আবার পেনরোজের প্রসঙ্গে ফেরৎ আসা যাক। উপরিপাতিত অবস্থায় থাকা বস্তুটি যত বেশি ভর সম্পন্ন হবে, তার শক্তির অনিশ্চয়তার পরিমাণও তত বড় হবে। সেক্ষেত্রে ঘটনাটি একটি স্বল্পস্থায়ী ব্যাপার হবে। যখন ক্ষুদ্র কণিকা নিয়ে কথা তখন খুব সামান্য স্থান-কাল বক্রতা দেখা দেবে বিধায় শক্তির অনিশ্চয়তাটি ক্ষুদ্র হবে, কাজেই দীর্ঘ সময় ধরে উপরিপাতন বজায় থাকবে, এত দীর্ঘ যে মনে হতে পারে আমাদের সময়ের নিরিখে প্রায় অনন্ত কাল। অথচ এটিই যখন বেড়াল বা চাবির গোছাকে নিয়ে হয় তখন ব্যাপারটি আমাদের সময়ের নিরিখে এতই ক্ষণস্থায়ী হবে যে দিব্যি মনে করা যেতে পারে যে উপরিপাতন আদৌ ঘটেনি। অংক কষে পেনরোজ দেখিয়েছেন যে প্রোটন কণিকার মত ক্ষুদ্র ভরের একটি জিনিসের জন্য উপরিপাতনটি কোটি কোটি বছর স্থায়ী হতে পারে। পরমাণু অথবা অণুর ক্ষেত্রে এলে সময়টি কমে বটে, কিন্তু তাও উপরিপাতনের স্বয়ংক্রিয় অবসান দেখতে পাওয়ার মত নয়, আমাদের সময়ের নিরিখে তখনো তা অতি দীর্ঘ থাকে। কিন্তু একটি চুলের ব্যাসের সমান আয়তনের বস্তুতেও যদি আমরা আসি তখন ঐ সময়টুকু হয়ে পড়ে সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের মত ছোট- যাকে অনায়াসে তুচ্ছ করা যায়। তা হলে একটি বেড়ালের আয়তনের বস্তুর ক্ষেত্রে উপরিপাতন কার্যত নাকচ হয়ে যাচ্ছে– অর্থাৎ বেড়ালকে একই সঙ্গে এ অবস্থায় এবং ঐ অবস্থায় পাওয়ার প্রশ্ন আর উঠছে না।

শ্রোডিংগারের সংকটে বেড়াল সত্যিই একটি মাত্র অবস্থায় রয়েছে (হয় জীবিত, নয় মৃত) এটি বলতে পারার একটি উপায়ই রয়েছে- তা হলো পর্য্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপরিপাতনের অবসান ঘটানো। সে রকম অবসান হবে পর্য্যবেক্ষণ-নির্ভর, আভ্যন্তরীণ ভাবে বস্তু-নিষ্ঠ নয়। পেনরোজ এখন যার ভিত্তিতে উপরিপাতনের অবসান দেখাচ্ছেন সেটাকে বলা যায় বস্তু-নিষ্ঠ অবসান–আমরা

বেড়ালের বাঁচা মরার অবস্থা দেখতে যাই আর না যাই, তার অবস্থায় কোন দ্বৈততা বা উপরিপাতন এতে থাকছেনা। বস্তুনিষ্ঠভাবে সে হয় জীবিত নয় মৃত অবস্থায় আছে। অবস্থার উপরিপাতনের এরকম বস্তুনিষ্ঠ অবসানের একটি সম্ভাবনার কথা প্রয়াত নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যানও ইঙ্গিত করেছিলেন, এবং তিনিও বলেছিলেন ব্যাপারটি কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও আপেক্ষিক তত্ত্বের সমন্বয়েই ঘটতে পারে। আরো কোন কোন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ পেনরোজের ব্যাখ্যাটিকে মৃদু সমর্থন দিচ্ছেন। কিন্তু পেনরোজ যেমন তাঁর ব্যাখ্যাটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বে পরিণত এখনো করেন নি, সাধারণভাবে পদার্থবিদরা একে শ্রোয়েডিংগার সংকট থেকে নিশ্চিত কোন পরিত্রাণ বলে এখনো মেনে নিচ্ছেন না।

পেনরোজ ও তাঁর সমমনা বিজ্ঞানীরা অবশ্য অণু-পরমাণুর জগতে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অদ্ভুত সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করছেন না। সাক্ষ্য প্রমাণ সেখানে এত প্রবল যে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কাজেই ব্যাপারটি যতক্ষণ একটি ইলেকট্রনের কিংবা একটি পরমাণুর– একই সঙ্গে উপরিপাতিত বিভিন্ন অবস্থায় থাকা নিয়ে ততক্ষণ তাঁরা সেটি মেনে নিচ্ছেন। পেনরোজের আপত্তি হলো এর চেয়ে বড় বস্তুকে নিয়ে– যেমন দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো নিয়ে আমাদের নাড়াচাড়া করতে হয় সেগুলোকে এ রকম এখানেও আছে ওখানেও আছে এভাবে বলা যাবেনা, সেটা বেড়ালই হোক আর চাবির গোছাই হোক। পরমাণুর ক্ষেত্রে বলা যাবে, অথচ বেড়ালের ক্ষেত্রে বলা যাবে না– এমন দাবীর পেছনে পেনরোজের বৈজ্ঞানিক যুক্তি আমরা দেখেছি। শুধু বল্‌লেতো চলবেনা যে এটি আমার সাধারণ বুদ্ধিতে সায় দিচ্ছেনা, যুক্তিটা আধুনিক স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে ধোপে টিকতে হবে। পেনরোজ ঠিক তাই করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এর জন্য ব্যবহার করেছেন খোদ কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের নিয়মাবলী। শুধু তাই নয়, এ যুক্তির প্রমাণের জন্য সম্ভাব্য পরীক্ষণের রূপরেখাও তিনি দিয়েছেন, যে পরীক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভব এবং হয়তো তা সম্পন্ন হয়ে শিগ্‌গির একদিন পেনরোজের ধারণাকে সঠিক অথবা ভুল প্রমাণিত করবে।

বহু-বিশ্বের ধারণা

বস্তু মাত্রেরই ক্ষেত্রে অবস্থার উপরিপাতনের সৃষ্ট দ্বৈতাকে আরো একভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এ জন্য পদার্থবিদদের অনেকে বলেন বিশ্ব আসলে একটি নয়– রয়েছে অনেকগুলো সম্ভাব্য বিশ্ব। পর্য্যবেক্ষণ করার পরই ঠিক হয় কোন বিশ্বটি আসলে প্রাসঙ্গিক। এই ব্যাখ্যায় অর্ধস্বচ্ছ কাঁচে ফোটনটি আঘাত হানার পর পরই দুটি ভিন্ন সম্ভাব্য বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে– একটিতে বেড়াল বেঁচে আছে, অন্যটিতে বেড়াল মরে

গেছে। পর্য্যবেক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত এই দুই বিশ্বই সমানে গ্রহণযোগ্য। পেনরোজ বলেন এভাবে কথায় কথায় পুরা বিশ্বকে এত অসংখ্য রকমের বিকল্প বিশ্বে বিভক্ত করার চিন্তা তিলকে তাল করার মত। বেড়ালের বাঁচা মরার মত একটি স্থানীয় ঘটনার জন্য বহু-বিশ্বের অবতারণা পাগলামি মাত্র। এরকম কত ঘটনাই তো প্রতি মুহূর্তে কত জায়গায় ঘটতে পারে। এর প্রত্যেকটির জন্য প্রতি মুহূর্তেই কি বিশ্বকে অসংখ্যবার বিভক্ত করেই চলতে হবে? পেনরোজের মতে এটি কোন ব্যাখ্যা হলো না। এতে একই পর্যাবেক্ষকের দুটি ভিন্ন অবস্থার (একটি জীবন্ত বিড়াল দেখার আনন্দিত অবস্থা, অন্যাটি মরা বেড়াল দেখার দু:খিত অবস্থা) ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে তারা দুই পৃথক বিশ্ব থেকে ব্যাপারটিকে দেখছে এই বলে। আপনি যদি নিজেকে এরকম একটি অবস্থায় আছেন চিন্তা করেন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে হবে যে আপনার একটি প্রতিলিপি অন্য একটি সমান্তরাল বিশ্বে থেকে একে অন্য অবস্থায় দেখছে। এর মধ্যে যে শুধু পরিমিতিবোধের অভাব থাকছে তাই নয়, এই যে দুই বিশ্বের বিভক্তি ঘটানো হলো পর্য্যবেক্ষণকে শুধু জ্যান্ত বেড়াল বা শুধু মরা বেড়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে, তারো বা কি যুক্তি আছে? একই সঙ্গে জ্যান্ত আর মরা বেড়াল পর্য্যবেক্ষণ করতে দোষ কি? পর্য্যবেক্ষণ ব্যাপারটিই আসলে কি, পর্য্যবেক্ষণের সে রকম কোন থিওরি যদি না থাকে যাতে ঐ একই সাথে দেখা নিষিদ্ধ– তা হলে দুই বিশ্বের কল্পনাও কোন স্বস্তি এনে দেয়না।

প্রস্তাবিত পরীক্ষণ

কাজেই পেনরোজের কাছে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'বড়' জিনিসের পর্যায়ে এসে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তুচ্ছ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন সমাধান নেই। মহাকর্ষের আইনষ্টাইনীয় তত্ত্ব আর অনিশ্চয়তার হাইজেনবার্গের তত্ত্বের বরাত দিয়ে তিনি যেভাবে তাকে তুচ্ছ করার ব্যবস্থা করেছেন সেটি আমরা দেখেছি। এবার দেখা যাক তিনি তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে কি পরীক্ষণের প্রস্তাব করছেন। এ কাজের জন্য তিনি জোট বেঁধেছেন অক্সফোর্ড সেন্টার ফর কোয়াণ্টাম কম্প্যুটেশনের বিজ্ঞানী বাউমিষ্টার আর মার্শালের সঙ্গে। পরীক্ষণের কুশলতা নিয়ে এই দু'জন বিজ্ঞানী এ কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন এমন একটি স্যাম্পল বস্তু– যা অণু-পরমাণুর মত অত ক্ষুদ্র নয়, আবার বেড়ালের মত অত বড়ও নয়। তবে পেনরোজের ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতার বিচার করতে এটিই হবে যুৎসই। জিনিসটা হচ্ছে একটি ছোট্ট কৃষ্টাল যা এক মাইক্রোমিটারের (মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ) চেয়েও ছোট, তবে এর মধ্যেই রয়েছে অসংখ্য পরমাণু। কৃষ্টালটি ছোট্ট হলেও কোয়ান্টাম জগতের বিচারের একে বিশাল বলা যায়, সেদিক থেকে এটি অনেকটা আমাদের আটপৌরে 'বড়' জিনিসের জগতেরই সদস্য। এই কৃষ্টালটিকে

যদি দুটি উপরিপাতিত অবস্থায় থাকতে হয়, তাহলে পেনরোজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপরিপাতনের স্থায়ীত্ব এক সেকেন্ডের একশ'ভাগের এক ভাগ থেকে দশ ভাগের এক ভাগের মধ্যেই থাকার কথা। এরকম সময়কে অপেক্ষাকৃত সহজে মাপা যায়, এবং কোন মতেই তাকে কোয়ান্টাম জগতের দীর্ঘ, প্রায় অনন্তকাল স্থায়ী উপরিপাতনগুলোর সমগোত্রীয় বলা যাবে না।

পরীক্ষণটি শুরু হবে রশ্মি-বিভাজক অর্ধস্বচ্ছ একটি কাচের উপর লেজার উৎস থেকে একটি ফোটন ছুড়ে দেয়ার মাধ্যমে (অনেকটা যে ভাবে রশ্মি-বিভাজকের উপর বিড়াল মারার ফোটন ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল)। রশ্মি–বিভাজকে পড়ে ফোটনটি হয় এর মধ্য দিয়ে চলে যাবে, অথবা প্রতিফলিত হয়ে অন্য দিকে যাবে। এভাবে এটি দুটি পথের যে কোন একটি দিকে যেতে পারে। প্রথম পথটিতে গেলে এটি একটি আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে আবার সেই রশ্মি–বিভাজকে ফেরৎ আসবে আর দ্বিতীয় পথে গেলে ফোটনটি একটি কার্বনের সূতায় ঝুলন্ত অবস্থায় স্যাম্পল কৃষ্টালটিতে আঘাত করবে। ফোটনের আঘাতে কৃষ্টালটি সামান্য একটু হেলে যাবে। ফোটনটি কোন পথে গেল তার উপর নির্ভর কওে কৃষ্টালটির অবস্থানের দুই ভিন্ন অবস্থা দেখা দেবে (হেলে না যাওয়া অথবা হেলে যাওয়া), এবং এর অবস্থান এই দুই অবস্থার উপরিপাতনে থাকবে। কৃষ্টালকে আঘাত করে, তার গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে লেজার ফোটনটি চলে যাবে দ্বিতীয় আর একটি আয়নার দিকে। এই আয়নাটির এমন দূরত্বে রাখা হবে যেন এ আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ফোটনটি আবার কৃষ্টালের ওখানে যখন ফেরৎ যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে কৃষ্টালটি হেলে যাওয়া অবস্থান থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরৎ এসেছে। এইবার কৃষ্টাল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফোটনটি ঐ রশ্মি-বিভাজকে আদি অবস্থায় ফেরৎ যাবে। অর্থাৎ যে দুটি অবস্থার উপরিপাতনে কৃষ্টালটি থাকছে তার একটিতে ফোটন অন্যদিকে গিয়ে ফিরে এসেছে কৃষ্টালকে আঘাত না করে; আর একটিতে কৃষ্টালকে আঘাত করে হেলিয়ে দিয়ে, পরে আবার আঘাত করে তারপর ফিরে এসেছে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নিয়ম যদি সঠিক হয়, অবস্থার উপরিপাতন যদি থাকে, তা হলে রশ্মি-বিভাজকে ফিরে আসার পর ফোটন যে পথে শুরুতে লেজার উৎস থেকে এসেছিল, সে পথেই একেবারে অপরিবর্তিত অবস্থায় লেজার উৎস ফেরৎ যাবে। দুই অবস্থার উপরিপাতিত অবস্থায় আছে বলে উল্লিখিত কোন একটি পথে রাখা ফোটন-উদঘাটন যন্তে এটি সাড়া জাগাতে পারবেনা। কারণ এরকম উদঘাটন যন্ত নিজেও এই উপরিপাতনের মধ্যে থাকবে, ফোটন দেখতে পাওয়া ও ফোটন না দেখতে পাওয়ার মধ্যে। এই একই এক্সপেরিমেন্ট বার বার করে যদি উদঘাটন যন্তে সাড়া না পাওয়া যায়, তা হলে বুঝে নিতে হবে যে ফোটনের কাছে দুই পথের

উপরিপাতিত 'চেতনা' রয়েছে, কোন একটি পথে গিয়ে ধরা পড়ার কোন 'ইচ্ছে' তার নেই– এটাই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অদ্ভুত বিধান।

কিন্তু যদি পরীক্ষকরা পরীক্ষণটিকে এমনভাবে সাজাতে পারেন যে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ফোটনের এসব আসা যাওয়ায় এক সেকেন্ডের এক দশমাংশের চেয়ে বেশি সময় লাগে, তাহলে পেনরোজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ওর মধ্যে থাকতে থাকতেই উপরিপাতনের অবসান হবে, কারণ উপরিপাতনের স্থায়ীত্ব এই সময়ের চেয়ে কম। এর মানে ফোটন যখন রশ্মি-বিভাজককে ফেরৎ আসবে, ইতোমধ্যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিধান অকার্যকর হয়ে গেছে, এখন ফোটনের কাছে 'মনে হবে' সে দুই পথের যে কোন একটিকে বেছে নিয়ে সেটি অনুসরণ করেই এসেছে। এখন ফিরে আসা ফোটন রশ্মি-বিভাজক থেকে লেজার উৎসে ফিরে যেতে পারে উদঘাটন যন্ত্রে সাড়া না জাগিয়ে, অথবা এর থেকে প্রতিফলিত হয়ে উদঘাটন যন্ত্রে সাড়া জাগাতে পারে। যেহেতু এর উভয়ের সম্ভাবনা অর্ধেক-অর্ধেক, কাজেই বেশ কয়েকবার পরীক্ষণটি করলে অর্ধেক সংখ্যক ক্ষেত্রে উদঘাটন যন্ত্রে সাড়া জাগবে। আর তেমনটি যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে পেনরোজের ব্যাখ্যা সঠিক, বড় জিনিসের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপরিপাতন প্রাসঙ্গিক নয়।

কাগজে কলমে পরীক্ষণটিকে বেশ সম্ভবই মনে হলেও, ব্যাপারটি কিন্তু সত্যি সত্যি করতে এত সহজ হবে না। এটি করতে হলেও বেশ কিছু কারিগরি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যেতে হবে। প্রথমত নিশ্চিত করতে হবে যে ফোটনের ঐ যে উপরিপাতিত হবার দুটি অবস্থা তা এর বহির্ভূত কোন কারণে বিঘ্নিত হবে না। এরকম বিঘ্ন ঘটাবার অনেক জিনিসই রয়েছে, যেগুলোর কারণেও উপরিপাতনের অবসান হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্টালের মধ্যে তাপীয় শক্তির কারণে পরমাণুগুলোর যে কম্পন তাও এমনটি ঘটাতে পারে। যদি এসব বিঘ্নকে কমিয়ে ন্যূনতম অবস্থায় আনা না যায় তা হলে নিশ্চিত হওয়া যাবেনা যে ব্যাপারটি পেনরোজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কারণে ঘটলো কি না। ফোটনের প্রকৃতি নির্বাচনও একটি বড় সমস্যা। কারণ পরীক্ষণটির জন্য একটি মাত্র ফোটনের যে পরিমাণ শক্তি দরকার তা একমাত্র এক্সরে ফোটন দিয়ে সম্ভব–দৃশ্যমান আলোর বা অনুরূপ ফোটন দিয়ে নয়। কিন্তু এক্সরে কে প্রতিফলিত করা খুবই দুরূহ কাজ। আরো বড় কথা হলো যে কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের আওতামুক্ত হবার জন্য পরীক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে ফোটনটির আসা যাওয়াতে এক সেকেণ্ডের এক দশমাংশের বেশি সময় লাগাতে হবে। আলোর গতির কথা বিবেচনায় রাখলে এর যাত্রাপথকে তাই করতে হবে অনেক দীর্ঘ, প্রায় পৃথিবীর ব্যাসের সমপর্যায়ের। এর ব্যবস্থা করার একটি উপায় হলো পরীক্ষণটি মহাশূন্যে করা। পৃথিবীর চারিদিকে একই কক্ষ পথে

পরিক্রমণশীল দুটি পাটাতনে এ পরীক্ষার দুই অংশ রাখা যেতে পারে, যাতে ফোটনটিকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এক অংশ থেকে অন্য অংশ যেতে হয়।

অনড় পদার্থবিজ্ঞানীগণ

বর্তমান প্রযুক্তির আওতায় পরীক্ষণটি করা যাবে কিনা বুঝা যাচ্ছে না। গেলেও এর বিশাল ব্যয় কেউ যোগাবে কিনা তাতেও সন্দেহ রয়েছে। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানী এ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নিঃসন্দেহ - কারণ কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের ভিত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে এমন পরীক্ষণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখলেও পদার্থবিদদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই কিন্তু মনে করেন পেনরোজ যা চাচ্ছেন তা প্রমাণিত হবে না। এমনকি বাউমিষ্টার– যার সঙ্গে মিলে পেনরোজ এই পরীক্ষণের ডিজাইন করেছেন– তিনি নিজেও এটিই মনে করেন। তাঁর মতে বড় জিনিসের ক্ষেত্রে এসে কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের উপরিপাতনের ধারণা উবে যাবে এমন ভাবার কারণ নেই। "কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের বক্তব্যটি এতই সরল এবং সুন্দর যে আমাদেরকে সেটি যেমনি রয়েছে তেমনি ভাবেই গ্রহণ করা উচিত, হোকনা সে মানব-মনের বিচারে অদ্ভুত"।

রোজার পেনরোজের এক সময়ের যৌথ গবেষক বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ষ্টিফেন হকিন্সও এ বিষয়ে পেনরোজকে মোটেই সমর্থন দেননি। হকিন্সের মতে স্থান-কালের বস্তু সৃষ্ট বিকৃতির কারণে শক্তির যে বিবর্তন ঘটে তাতে কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের উপরিপাতনের অবসান হবে এমন কথা স্বীকৃত তাত্ত্বিক ধারণাগুলোর আলোকে প্রমাণিত হয়না। আর পেনরোজ স্বীকৃত ধারণাগুলোকে ভুল প্রমাণিত করে কোন বিস্তারিত তত্ত্বও খাড়া করেননি যে এর অন্যথা হবে। সব চেয়ে বড় কথা হলো উপরিপাতন অবসানে পেনরোজের এই কষ্ট-কল্পিত ব্যাখ্যাটির প্রয়োজনই নাই। এটি তিনি শুধু সৃষ্টি করেছেন শ্রোডিংগারের বেড়ালকে জীবন্মৃত অবস্থা থেকে বাঁচাতে। কিন্তু পেনরোজের নিজের মতেই তাঁর উপরিপাতনের অবসানের 'বস্তুনিষ্ঠ' ব্যাখ্যাটির যে এফেক্ট সেটি দুর্বলভাবে আসে। বেড়ালকে জীবিত বা মৃত একটি মাত্র অবস্থায় নির্দিষ্টভাবে পাওয়ার অর্থাৎ উপরিপাতন অবসানের অন্য আর যে পদ্ধতিটি সবার জানা সেটি হলো বাইরের পরিবেশের সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণের ফলে এর অবসান। পেনরোজ নিজেই বলেছেন তাঁর দুর্বল এফেক্টটিকে কার্যত এই পরিবেশ-সৃষ্ট অবসান থেকে পৃথক করা দুরূহ। সে ক্ষেত্রে বেড়ালের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব বাইরের পরিবেশের সঙ্গে বিক্রিয়ার উপর ছেড়ে দিলেই তো চলে। এখন অবশ্য পেনরোজ তাঁর পরীক্ষণের প্রস্তাবটি করার পর এই

পরীক্ষণের মাধ্যমে তাঁর এফেক্টটি সত্যি সত্যি দেখা যাওয়ার একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ সম্পর্কে হকিন্স কি বলেন এটি আপাতত লক্ষ্যণীয়।

বলা বাহুল্য অধিকাংশ পদার্থবিদ হকিন্সের সঙ্গে অভিন্ন মতেরই অনুসারী। তাঁদের কাছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অবস্থার উপরিপাতন বহু পরীক্ষণে প্রমাণিত একটি ধ্রুব সত্য। এটি পদার্থের একটি অত্যাবশ্যকীয় ধর্ম- ছোট জিনিস, বড় জিনিস বলে কোন কথা নেই। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী সেলিংগার এই মতের অনুসরণে আরো খানিকটা এগিয়ে গেছেন। তাঁর ল্যাবেরোটরীতে বিজ্ঞানীরা একটি ফোটন মাত্র নয়- রীতিমত একটি বড়সড় অণু ফুলারিন যাতে ৬০টি কার্বন পরমাণু থাকে- সেটিই ছুড়ে দিয়েছেন পাশাপাশি দুটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে। আর একই সঙ্গে দুটি ছিদ্র দিয়েই চলে গিয়ে (!) এটি প্রমাণ করেছে বিস্ময়কর রকমের 'বড়' জিনিসেও অবস্থার উপরিপাতন রয়েছে। সেলিংগার এখন বেশ আস্থার সঙ্গেই বলছেন যে পরীক্ষণের দক্ষতা বাড়ানোর দ্বারা তাঁরা শিগ্‌গিরই আরো বড় বস্তুর ক্ষেত্রেও উপরিপাতন হাতে নাতে দেখিয়ে দেবেন। হয়তো ব্যাকটেরিয়ার মত ক্ষুদ্র জীব নিয়েও তাঁরা এটি করবেন। আর ব্যাকটোরিয়ার ক্ষেত্রে যদি এটি হতে পারে - আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বেড়ালের ক্ষেত্রে নয় কেন? বোঝা যাচ্ছে অধিকাংশ বিজ্ঞানী এখনো শ্রোডিংগারের বেড়ালটিকে জীবিত-মৃত এই উপরিপাতিত অবস্থাতেই রেখে দিতে ইচ্ছুক, সে 'আসলে' বেঁচে আছে কিনা এই প্রশ্নে তাঁরা নিরাসক্ত।

প্রশ্নের শেষপ্রান্তে:স্ট্রিং থিওরি

মহাবিশ্বের বস্তু ও শক্তিজগতের মৌলিক উপাদান কী এ প্রশ্ন পদার্থবিদদের বহুকালের মূল প্রশ্ন। এর উত্তর দিয়ে দিয়েও দেয়া হয় নি আজ অবধি। তবে বেশ কিছু দিন ধরে কণিকাবিদরা এর জন্য একটি আদর্শ মডেল খাড়া করেছেন যা বর্তমানের সকল পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু যারা এতে অতৃপ্ত তারা এর মধ্যে নানা না-বলা কথা থেকে যাচেছ বলে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলছেন; যে-সব প্রশ্নের উত্তর আজকের আদর্শ মডেল দিতে পারে না। এ যেন শিশুর প্রশ্ন করার মতো যে- কোনো কিছুর ব্যাখ্যা পেয়েও তার পেছনে আরও ব্যাখ্যা চায়। লোকটি হাতড়িয়ে চলছে কেন? সে অন্ধ বলে। অন্ধ কেন? চোখে অসুখ হয়েছিল বলে। অসুখ হল কেন?– এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না উত্তরদাতার জানার সীমা (অথবা ধৈর্যের) অতিক্রম করে গিয়ে বলতে হয়– তা ওরকমই হয় বলে। কণিকাবিদদের জগতে আজকে এই শিশুর ভূমিকাটি পালন করছে স্ট্রিং থিওরির প্রবক্তারা। তাঁরা আদর্শ মডেলকে ছাড়িয়ে আরও বেয়াড়া রকমের প্রশ্ন তুলছেন। উত্তর না পেয়ে নিজেরা কিছু উত্তর দাঁড় করাচেছন যেগুলোও খুব যুৎসই হচেছ না।

মূল প্রশ্নটি হল, আদর্শ মডেল কেন প্রকৃতির পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলোর সঙ্গে মিলে যাচেছ? এই মডেলের মধ্যে রয়েছে অন্তত বিশ রকমের রাশি যার মান ঐ তত্ত্ব থেকে অঙ্ক কষে বের করার কোনো উপায় নেই, পরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকেই এগুলো আসতে হয়। এ সব রাশির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মৌলিক কণিকার ভর, চার্জ, তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ার প্রাবল্য ইত্যাদি– যার সবই পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকেই জেনে নিতে হয়েছে। এদের কোনো-কোনোটির মান যদি যেমনটি রয়েছে তেমনটি না হয়ে একটু এদিক-ওদিক হত তা হলে বিশ্বটাই থাকত না, এসব নিয়ে ভাবার জন্য আমরাও থাকতাম না। তাহলে ঠিক এমনটিই মান হবে,

এটি কীভাবে ঠিক হল? আমরা যেটি যেমন পেয়েছি তাকে সেভাবে ধরে নিয়ে শুধু তাদের শৃঙ্খলাটি উদ্‌ঘাটন করছি আদর্শ মডেলে। কিন্তু পরম তত্ত্বের সন্ধানী স্ট্রিং থিওরির প্রবক্তারা এতে সন্তুষ্ট নন। তাঁরা এর মধ্যে নানা প্রশ্ন তুলছেন– সেই শিশুর মতো।

কণিকাবিদ্যার জগতে কণিকার তিনটি পরিবার রয়েছে; প্রত্যেক পরিবারের সদস্যরা ভর ছাড়া আর সব গুণাগুণের দিক থেকে অভিন্ন। কিন্তু পরিবার তিনটিই কেন? আমাদের বাস্তব বিশ্বে স্থানের তিনটি মাত্রাই কেন রয়েছে, আর কালের একটি– এর কম বা বেশি হল না কেন? আদর্শ মডেলে মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়ার কোনো উল্লেখ নাই কেন?

এই শেষের প্রশ্নটাই পদার্থবিদদের কাছে খুব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাধ্যাকর্ষণকে বিশ্বচিন্তার মূলস্রোতে স্থান করে দেবার চেষ্টাটি আইনস্টাইনই প্রথম করে গেছেন তাঁর আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের মাধ্যমে। তিনি দেখিয়েছেন স্থান-কালের রয়েছে মসৃণ এবং আস্তে বেঁকে-যাওয়া একটি জ্যামিতিক গড়ন। এর ব্যাখ্যাটাই নির্ধারণ করে কোনো স্থানে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের প্রাবল্য কতখানি তা। আবার উল্টো এই প্রাবল্যই নির্ধারণ করে দেয় বক্রতাটি কতখানি হবে। অর্থাৎ কিনা বস্তুপুঞ্জ বেশি হলে বক্রতাও তার আশপাশে বেশি হবে। এই সুন্দর নির্ভেজাল তত্ত্বের সঙ্গে পরে বাধ সেধেছে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের কিছু বাধ্যবাধকতা। মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র যেহেতু কোয়াণ্টাম তত্ত্বেরও অধীন, কাজেই এর মধ্যে কোয়াণ্টাম ওঠা-নামাটিও থাকতে বাধ্য যা কিনা আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে সমর্থিত নয়। এ জন্যই যে-কোনো পরম তত্ত্বের মধ্যে এর সমাধান হওয়াটি জরুরি।

স্ট্রিং থিওরি আরও গভীরে গিয়ে এ ধরনের প্রশ্নকে বিবেচনা করাতে জোর দিচেছ তত্ত্বের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সুসামঞ্জস্যতাকে (ইনটারনাল কনসিস্টেন্সি)। তাঁরা এমন একটি তত্ত্বের প্রয়াসী যার মধ্যে এই আভ্যন্তরীণ সুসামঞ্জস্যতার প্রয়োজনটিই বলে দেবে বস্তু আর শক্তির বিভিন্ন রাশিগুলোর মান, আর সেই মান বাস্তবে পরীক্ষালব্ধ মানের সঙ্গে মিলে যাবে। প্রকৃতির ব্যাখ্যায় এই রকম সৌম্য-সুন্দর সমাধান পদার্থবিদদের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত জিনিস। কিন্তু এখনও তা দুর্লভ। এ পর্যন্ত এর সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়েছে বলে যে তত্ত্ব দাবি করছে– তা হল সুপার স্ট্রিং থিওরি।

এই থিওরির মতে আদর্শ মডেলের বক্তব্য অনুযায়ী বিশ্বের মৌলিক উপাদান হিসেবে যে পরম কণিকাগুলোকে মনে করা হয় তা আসলে ঠিক নয়। এই মৌলিক উপাদান হল আসলে এক মাত্রিক (যেমন, সুতা এক মাত্রিক, এ জন্যই নাম হয়েছে স্ট্রিং বা সুতাতত্ত্ব) ক্ষুদ্র আঁশের মতো জিনিস যা সর্বক্ষণ কম্পনশীল। এর

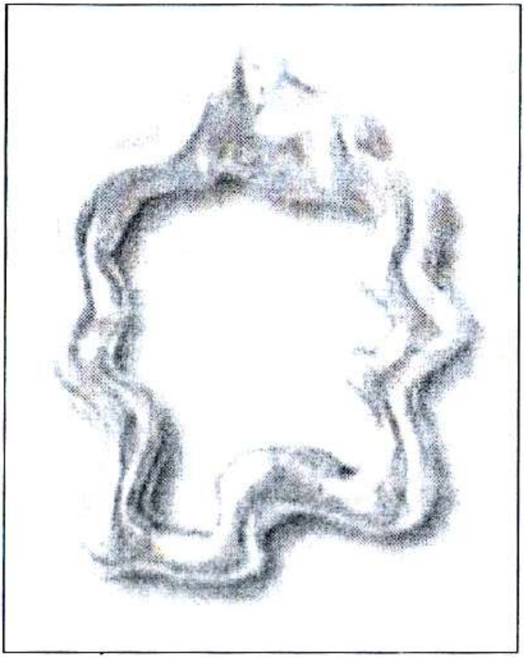

যে দৈর্ঘ্য তা এত ক্ষুদ্র যে, বর্তমান উচচশক্তি-পদার্থবিদ্যার হাতে বাস্তব পরীক্ষণের যে-ব্যবস্থা রয়েছে তাতে ধরা পড়ার মতো সাইজের চেয়ে অনেক-অনেক গুণে ছোট ($১০^{১৬}$ গুণ ছোট)! আঁশগুলোর কম্পনের যে বিভিন্ন প্যাটার্ন তাতেই আমাদের পরিচিত মৌলিক কণিকাগুলোর নানা ভর, চার্জ ইত্যাদি গুণাগুণে এরা বিশিষ্টতা লাভ করে। অর্থাৎ কিনা কণিকাবিদ্যার সব পরম রূপ এই আঁশের আচরণের মধ্যেই নিহিত।

পরীক্ষণে ধরাছোঁয়ার অতীত এমন একটি তত্ত্ব নিয়ে এত উৎসাহী হবার কারণ কী? একে তো এর মধ্যে সব কিছুকে একীভূত একটি ছবিতে নিয়ে আমার আশ্বাস রয়েছে। তার চেয়ে বেশি হল দুটি বিষয়ে এটি আমাদের মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে বলে মনে হচেছ। একটি হল আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের পূর্বাভাস এটি দিচ্ছে। অন্যটি হল বিশ্বের স্থানকালের কতটি মাত্রা হবে তাও এটি নির্ধারণ করে দেবার দাবি করতে পারছে।

উনিশশ' সত্তরের দশকে কোয়ান্টাম স্ট্রিং থিওরি প্রথম খাড়া করার সময় এর একটি বড় দুর্বলতা মনে করা হয়েছিল এর মধ্যে একটি কণিকা স্বীকার করে নিতে হয়েছে

যা ভরহীন, অথচ যার অস্তিত্ব বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না। পরে অবশ্য বোঝা গেছে যে, এই অজানা কণিকাটির বিক্রিয়াগুলো অনেকটা কল্পিত কণিকা গ্রাভিটনের মতো– যাকে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের বাহক মনে করা হয়। যেমন, ফোটন হল বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের বাহক। নিম্নতর শক্তিতে স্ট্রিং-তত্ত্ব ঠিক আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের মতোই ফলাফল দিয়ে থাকে। মনে হচ্ছে যেন আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের সঙ্গে কোয়ান্টাম-তত্ত্বের যে অপরিচিতি ছিল, স্ট্রিং থিওরি এসে তা ঘুচিয়ে দিতে পারছে– বিশেষ কোনো চেষ্টা ব্যতীতই এর মাধ্যমে মাধ্যাকর্ষণের কোয়ান্টাম-তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে– বলা যায় এটি স্ট্রিং থিওরির একটি বড় সাফল্য।

আর একটি যে সাফল্যের কথা বলা হচ্ছে তা স্থান-কালের মাত্রা সংক্রান্ত। স্ট্রিং থিওরি স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে এই মাত্রার সংখ্যা দশ। মাত্রা কতগুলো হবে কোনো তত্ত্ব সেটি এ পর্যন্ত তাত্ত্বিকভাবে নির্ধারণ করে দিতে পারে নি– কিন্তু স্ট্রিং থিওরি তা দেবার দাবি করছে। কিন্তু মুশকিল হল আমাদের বরাবরের অভিজ্ঞতা বলে সেটি চার, দশ নয়। স্থানের তিন মাত্রা আর কালের এক মাত্রা–আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে এক হয়ে গাঁথা রয়েছে। একে দশ বলি কেমন করে?

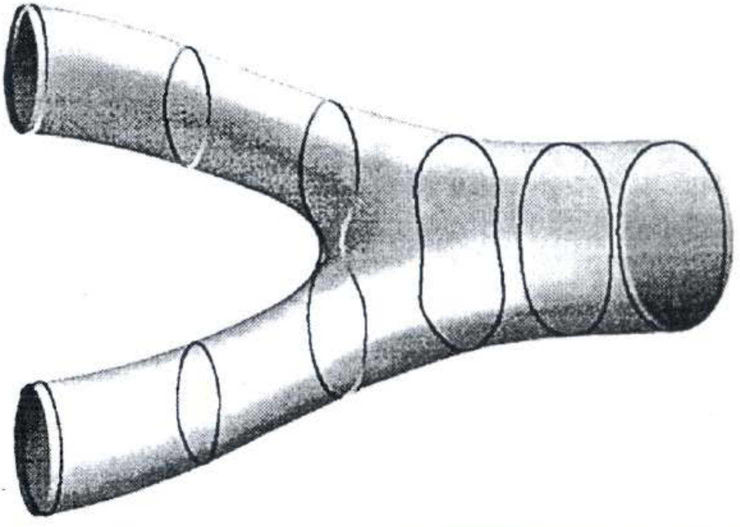

এ সম্পর্কে স্ট্রিং থিওরির বক্তব্য হল– দশটির মধ্যে চারটি মাত্রা বড় বলে তা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। বাকি ছয়টির স্কেল এত ছোট যে, তা বর্তমান পরীক্ষণে অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে, নিজের মধ্যেই নিজে লুকিয়ে থাকছে। এ সম্পর্কে দমকলের হোস পাইপের উপমাটি প্রায়ই দেয়া হয়। দূর থেকে হোসপাইপকে এক

মাত্রা বিশিষ্ট বলে মনে হয়– শুধু তার দৈর্ঘ্যটি। শুধু কাছে এসে দেখলেই বোঝা যায় যে, এটিও ত্রিমাত্রিক। তবে দশমাত্রিক স্থান-কালের লুকোনো মাত্রাগুলো প্রভাববিহীন নয়। এদের যে জ্যামিতিক গড়ন তা স্ট্রিং-এর কম্পনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এই মাত্রা ও স্ট্রিং উভয়েই তো অতি ক্ষুদ্র অবয়বের। কাজেই পরস্পরের কাছে এরা গুরুত্বপূর্ণ। এই কম্পনের উপর প্রভাবটি আমাদের কাছে ধরা দেয় মৌলিক কণিকাগুলোর ভর, চার্জ ইত্যাদি রূপে। মৌলিক কণিকার তিনটি পরিবারই কেন রয়েছে, এ সম্পর্কে স্ট্রিং থিওরির উত্তর হল ঐ লুকোনো ছয় মাত্রায় গড়া স্থান-কালের মধ্যে তিনটি গর্ত রয়েছে– যার এক-একটি এক-এক পরিবারের কণিকা সূচিত করছে। গর্ত তিনটিই থাকবে কেন তার পূর্বাভাস স্ট্রিং থিওরি এখনও দিতে পারে নি।

আর এক বিপদ হল এই যে, স্ট্রিং থিওরি, এটি কিন্তু একটি থিওরিতে সীমাবদ্ধ থাকে নি, সত্যিকার তত্ত্ব হবার জন্য প্রতিযোগিতা করছে এ রকম পাঁচটি প্রতিদ্বন্দ্বী স্ট্রিং থিওরির প্রস্তাব রয়েছে। আপাতত মনে হচেছ এদের প্রত্যেকটিরই আভ্যন্তরীন সুসামঞ্জস্যতার গুণটি রয়েছে, কাজেই শুধু এই গুণের ভিত্তিতে এদের মধ্য থেকে কোনো একটিকে বেছে নেবার উপায় নেই। একেবারে সাম্প্রতিককালের গবেষণার খবর হল এই পাঁচটি থিওরিকেই মনে করা হচেছ অন্তর্নিহিত একটি রহস্যময় থিওরির বিভিন্ন দিকের বহিঃপ্রকাশ। ঐ মূল থিওরির নাম দেয়া হয়েছে এম-থিওরি অর্থাৎ মাদার থিওরি অর্থাৎ কিনা ঐ পাঁচটির মা হল এটি। এই সম্পর্কটিকে একটি উপমা দিয়ে বোঝানো যায়। উত্তাপ দিলে বরফ গলে পানি হয়। বরফ আর পানি উভয়েই পানির আণবিক গঠনের মূল সত্ত্বাটির দুই বিভিন্ন রূপ। এ ক্ষেত্রে উত্তাপ যে ভূমিকা পালন করছে, স্ট্রিং থিওরির ক্ষেত্রে তা পালন করছে বিক্রিয়ার শক্তিটি। ঐ পাঁচটি থিওরির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যটি দেখা যাচেছ।

ঐ পাঁচটি থিওরির একটির মধ্যে দেখা যায় স্ট্রিং নিজে আর স্ট্রিং থাকছে না। কারণ এটি সুতার মতো এক মাত্রিক না হয়ে পরদার মতো দ্বিমাত্রিক হচেছ। এভাবে এম থিওরির মধ্যে তিন, চার, পাঁচ করে নয় মাত্রার পর্যন্ত মৌলিক জিনিস থাকার সুযোগ আছে। এভাবে থিওরির যখন বিকাশ ঘটে চলেছে এর থেকে কিন্তু পরীক্ষণে যাচাই করা যায় এমন কোনো পূর্বাভাস পাওয়া যাচেছ না। যদিও মনে হচেছ আগের স্ট্রিং থিওরির মতো এর নতুন রূপ এম থিওরিও পুরোনো অনেক প্রশ্নের উত্তরকে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিচেছ। সবাই না হলেও কিছু বিজ্ঞানী এর মধ্যে অনেক সম্ভাবনা দেখতে পাচেছন। হয়তো একদিন প্রশ্নের শেষপ্রান্তে তাঁরা পৌঁছতে পারবেন।

ডিএনএ কি বুদ্ধিমান?

জীব-বিবর্তন নির্ভর করে দৈবক্রমে বৈচিত্র সৃষ্টির উপর। জীবকোষের ডিএনএ বংশ-পরম্পরায় জীবনের যে নীল নক্শাকে বহন করে যায়, তা যদি একেবারে হুবহু নিঁখুত রূপে বাবা-মা'র থেকে সন্তানের কাছে যেত তা হলে বিবর্তনের মাধ্যমে কোন পরিবর্তন আসতোনা। জীবনের আদি প্রজাতি সেই আদি প্রজাতিই থেকে যেত— তার থেকে নূতন এবং আরো উন্নত প্রজাতির সৃষ্টি হতনা। সেটি যে হয় তার কারণ হল ডিএনএ'র প্রতিলিপি যখন তৈরি হয় তখন দৈবক্রমে (কখনো অন্য কিছুর প্রভাবে- যাও দৈবক্রমে) এর মধ্যে খুব অল্প স্বল্প ত্রুটি দেখা দেয়। এই ত্রুটির- ফল ঐ জীবের বেঁচে থেকে সন্তান উৎপাদন করার জন্য অনুকূলও হতে পারে, প্রতিকূলও হতে পারে। যদি অনুকূল হয় তা হলে সন্তানের মধ্যে ঐ 'ত্রুটি'পূর্ণ বৈশিষ্টটি দিয়ে যেতে পারবে বলে, এবং সন্তানরাও একই কারণে নিজেরাও এই বৈশিষ্টপূর্ণ অনেক সন্তান রেখে যেতে পারবে বলে, এই বৈশিষ্টটাই ক্রমে অধিক দেখা যাবে। হয়তো বা এরকম বড় পরিবর্তন নূতন প্রজাতি-সৃষ্টির দিকেও নিয়ে যেতে পারে তাদেরকে। আর যদি প্রতিকূল হয়, তা হলে এর কুপ্রভাবে যথেষ্ট সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা তার কমে যাবে বলে বৈশিষ্টটাও তার বংশধরের মাধ্যমে বেশি বিস্তৃত হবেনা, আপনিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দৈবক্রমে 'ত্রুটি' সৃষ্টি হবার এবং তা বিচিত্র রকমের হওয়ার সুযোগ যদি না থাকত, তা হলে এ সব অগ্রগতির প্রশ্নই উঠত না। তবে এখন মনে হচ্ছে এক্ষেত্রে ডিএনএ পুরোটাই দৈবের উপর নির্ভর করে না, বরং সে পরিবেশ থেকে ক্রমে শেখে এবং এক ধরনের 'বুদ্ধিমত্তার' পরিচয় দেয়।

ডিএনএতে যে বার্তা লিপিবদ্ধ থাকে তা সাধারণত বিশেষ বিশেষ প্রোটিন তৈরি করার নির্দেশনা। এ যেন এক ভাবে প্রোটিন তৈরির ছাঁচ হিসাবে কাজ করে। আসলে এটি প্রোটিনের উপাদান বিভিন্ন এমাইনো এসিডকে নানা ক্রমে সাজিয়ে নানা প্রোটিন তৈরি করে। মজার ব্যাপার হল বার্তাগুলো একেবারে এক কাজের এক বার্তা নয়। একই কাজ করতে পারে এমন বার্তা কয়েক রকমে আসতে পারে। যেমন একটি প্রোটিন তৈরিতে ছয় বিভিন্ন রকম কোড ডিএনএ তে থাকতে পারে, যার যে কোন একটিতেই কাজ চলে। অনেক সময় বিভিন্ন বার্তা একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, ডিএনএর পক্ষে কিছু 'স্বাধীনতা' থাকে বার্তাটি এর মধ্য থেকে কোনটি কিভাবে সে বাস্তবায়ন করবে। প্রোটিন তৈরির বার্তা ছাড়া ডিএনএর মধ্যে বাড়তি অনেক বার্তাও থাকে–যেমন প্রোটিনটি কখন তৈরি হবে, কোথায় তৈরি হবে ইত্যাদি নির্দেশনা দিয়ে। অনেক সময় অনেক বেদরকারী অংশও থাকে যার আদৌ কি উদ্দেশ্য তা বুঝা যাচ্ছে না।

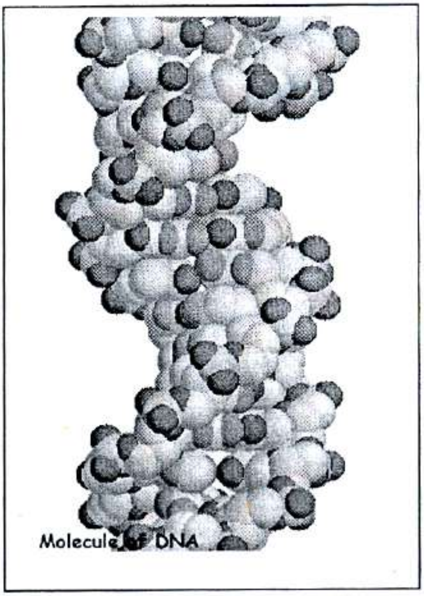

এ সবের মধ্যে একটি সম্ভাবনার কথা এখন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে তা হলো যাকে আমরা দৈবক্রমে পরিবর্তন বলছি, তারও অধিক বা অল্প সম্ভাবনার ইঙ্গিতটি ঐ ডিএনএর মধ্যেই হয়তো থেকে যেতে পারে? অর্থাৎ ডিএনএ বিবর্তিত হবে কি হবেনা সেই কথাটিও কি ঐ ডিএনএতেই লেখা থাকতে পারে? এবং এই লেখাটি ডিএনএ অর্জন করেছে পরিবেশের সঙ্গে তার মিথক্রিয়ার ফলে। যদি তা হয় তা হলে জীব বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের বহুদিনের ধারণা বদলে যেতে পারে। ব্যাপারটি পুরোপুরি দৈবক্রমে হচ্ছেনা, ডিএনএর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে– এমনটিই তখন মানতে হবে।

বিবর্তনের মধ্যে অনুকূল বংশগতিগুলো টিকে থাকে, উন্নতিও করে। একই ভাবে যেই জিনের বৈচিত্র সৃষ্টির সুযোগ বেশি, অনুকূল গুণ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি

থাকাতে তার পক্ষেও টিকে থাকার ও উন্নত হবার সুবিধা বেশি। উন্নত হবার জন্য দৈব বৈচিত্রের উপর নির্ভর করার চেয়ে নিজের মধ্যেই সেই সম্ভাবনাটির ঝোঁক তৈরি করে রাখাটি অবশ্যই বেশি সুবিধাজনক। এই বিষয়টি যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে কিন্তু জেনেটিক কারিগরি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে বাধ্য। এখন আমরা মনে করছি ডিএনএর বার্তা আমরা পড়তে পারছি, তাই ঐ বার্তাকে আমরা নিয়ন্ত্রণও করতে পারব। কিন্তু যদি এমন হয় যে ডিএনএর ঐ বার্তা একেবারে দৈবের হাতে ছেড়ে দেয়া কোন জিনিস নয়, বরং ডিএনএ নিজেই তার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে বিক্রিয়া করে সেই বার্তাকে এক বিশেষ দিকে নিয়ে গেছে, এবং ক্রমেই নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কিনা ডিএনএকে আমরা রোবটের মত মনে না করে 'বুদ্ধিমানের মত' অর্থাৎ শিক্ষা লাভে সক্ষম কিছু হিসাবে মনে করি তা হলে কিন্তু এর প্রতি আমাদের আচরণটিও ভিন্ন হবে। অনেক সময় তার উপর হস্তক্ষেপ করার চেয়ে বরং তাকে নিজপথে এগিয়ে যেতে দেয়াটাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে।

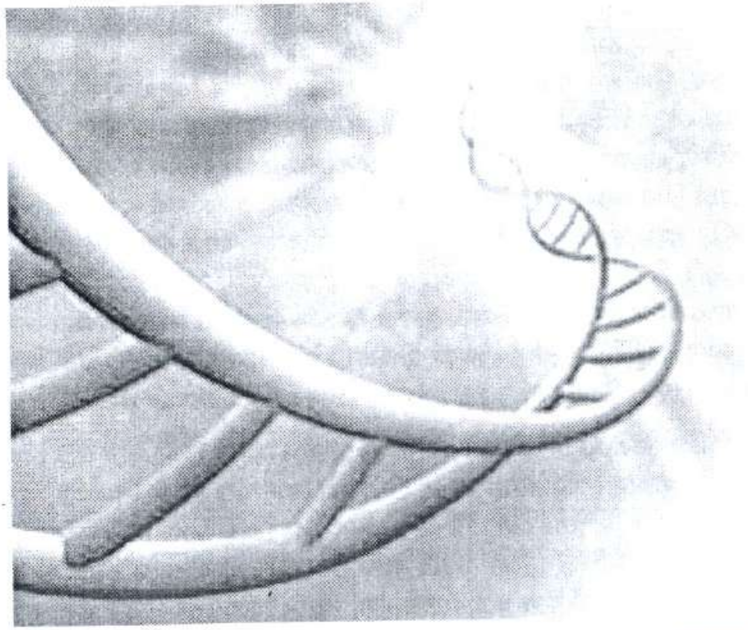

একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ নেয়া যাক। দেখা গেছে যে আমাদের জীবকোষে এমন একটি জিন আছে যা এইচ আই ভি ভাইরাসকে কোষে প্রবেশের সুযোগ

করে দেয়ার সহায়ক একটি প্রোটিন তৈরি করে। অল্প কিছু মানুষের মধ্যে এই জিনটি 'নষ্ট' থাকে। ফলে তাদের কোষে এইচ আইভি ভাইরাস কোন ভাবেই প্রবেশ করতে পারেনা, অর্থাৎ তারা এইডস রোগ থেকে একেবারেই মুক্ত। মনে করা যাক এইডস রোগ মানুষের মধ্যে আসার আগেই আমরা ঐ 'নষ্ট' জিনটিকে সারিয়ে ফেলেছিলাম যাতে মানুষের জিন সম্ভার থেকে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তা হলে কি হত? ঐ 'নষ্ট' জিন কিভাবে কাজ করে, ওটি তার কাছ থেকে শিখে একই কাজ করার জন্য এইডস বিরোধী ওষুধ তৈরির কোন সম্ভাবনাই আর এখন থাকতনা, যা এখন আছে।ভাগ্যিস ঐ অতীতে 'নষ্ট' জিন মেরামতের কোন সুযোগ আমাদের ছিলনা!

আমাদের ঐ নূতন ধারণাটির কথায় ফিরে আসি। বর্তমানে আমরা যে ভাবে এক একটি এ জীবে পুরো জিন-সম্ভার পরীক্ষা করে জেনে নিতে পারছি তার ফলে বিবর্তনের অন্তরালের বিষয়গুলো আরো ভাল করে দেখার সুযোগ হচ্ছে। তাতে ক্রমেই মনে হচ্ছে যে বিবর্তন একেবারেই কতগুলো বিচ্ছিন্ন দৈবঘটনার সমন্বয়, এমনটি জোর করে বলা যাচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ জিনের ডিএনএ বিন্যাসের মধ্যে অনেক সময় এক একটি অংশ পাওয়া যায় যাতে এর বার্তায় এক একটি 'অক্ষর' বিনা প্রয়োজনে বার বার লেখা রয়েছে। এ যেন 'কলম' শব্দটি লিখতে গিয়ে কোথাও লেখা হয়েছে কলললম, কোথাও বা আবার কললললললম । জেনেটিক্সের ভাষায় একে বলা হয় 'পিচ্ছিল ডিএনএ'। এ যেন ল অক্ষরে এসে পিছলে গিয়ে অনেক বার লিখে ফেলেছে। এধরনের ডিএনএ যেন নিজের প্রতিলিপি তৈরির সময় 'ত্রুটি' সৃষ্টির জন্য তৈরিই হয়ে থাকে। কারণ নকল করার সময় ঐ অক্ষরটি যে ঠিক কতবার লিখতে হবে তার হিসেব রাখা কঠিন হয় কাজেই ভুল ওখানে অনেক বেশিই হয় - আর সে সব ভুল এক এক সময় এক রকমের। দেখা যায় যে সাধারণ ডিএনএর চেয়ে 'পিচ্ছিল ডিএনএতে প্রতিলিপির ত্রুটি দেখা যাওয়ার, অর্থাৎ বৈচিত্র সৃষ্টির সম্ভাবনা হাজারগুণও বেশি হতে পারে।

ঐ পিচ্ছিল ডিএনএ কোথায় কত বেশি থাকবে তাও আবার নির্ভর করে এটি কোন জায়গায় থাকলে বৈচিত্রগুলো অনুকূল হয় আরো কোন জায়গায় প্রতিকূল হয়, আর কোন জায়গায় এ দুয়ের কোনটিই হয়না, তার উপর। এর উপর নির্ভর করে বংশ পরম্পরায় নানা পিচ্ছিল জিন বাড়বে বা কমবে। এক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে ডিএনএ দীর্ঘ কাল ধরে বংশের নানা পুরুষে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার থেকে 'শিখে' নেয় পিচ্ছিলতাগুলো সে রাখবে কি রাখবেনা তা। এদিক থেকে তাকে সম্পূর্ণ দৈবে সমর্পিত মনে না করে 'বুদ্ধিমান' মনে করাই কি সমীচিন নয়?

সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় ডিএনএর এরকম 'বুদ্ধিমান' হবার কিছু সুফল ঐ জীবের জন্য উপকারী হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেক জীবাণুর গায়ে একটি আবরণ থাকে যা ঐ জীবাণুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঐ আবরণের উপর নির্ভর করে জীবাণুটি যাকে আক্রমণ করবে তার শরীরের কোথায় নিজকে আটকে নিতে পারবে। আবার ঐ আক্রান্ত জীবের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জীবাণুটির এই আবরণ অনুযায়ীই এর বিরুদ্ধে তার নিরাপত্তা কৌশলটি তৈরি করে। আবরণ বদলে গেলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে, জীবাণুটির জন্য আক্রমণের কাজ সহজ হয়ে যায়। ঐ আবরণ তৈরির জিনে প্রচুর পিচ্ছিল ডিএনএ দেখা যায়, যাতে করে জীবাণুটির পরবর্তী বংশগুলোতে আবরণের বহু বৈচিত্র দ্রুত সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে এগুলো আক্রান্ত জীবের দেহের নূতন নূতন জায়গায় নিজকে আটকাতে পারে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যেই একটি আবরণের উপযুক্ত হয়ে উঠবে তক্ষুণি পরের বংশগুলোতে অন্য আবরণে চলে গিয়ে ঐ ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে পারে। এটি বেশি করতে হলে আবরণের জিনে বৈচিত্র সৃষ্টির প্রচুর সুযোগ থাকতে হয়। স্পষ্টত: ধীরে ধীরে প্রকৃতি থেকে শিখে নিয়ে জীবাণুর ডিএনএ বেছে বেছে ঐ আবরণ সৃষ্টির ডিএনএর মধ্যেই প্রচুর 'পিচ্ছিল' অংশ তৈরি করে নিয়েছে এই সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য। এসব একেবারে দৈব ভাবে হয়নি।

এরকম আরো উদাহরণ ডিএনএর ক্ষেত্রে রয়েছে। শরীরে প্রজনন কোষগুলো অর্থাৎ শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষগুলো যখন গঠিত হয় তখন তাদের ডিএনএতে ইতস্ত ত: বেশ কিছু কাটিং-পেষ্টিং এর কাজ চলে। অর্থাৎ ডিএনএ সূত্রকে এক জায়গায় কেটে অন্য জায়গায় জুড়ে দেয়ার বহু ঘটনা তখন ঘটে–যার ফলে নানা শুক্র কোষ ও নানা ডিম্বকোষের ডিএনএ গঠন আর এক থাকে না–একই দম্পতির সন্তানদের মধ্যে তাই বহু রকম বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে। মনে করা হতো এই কাটিং-পেষ্টিং প্রক্রিয়াটি একেবারেই ইতস্তত: বা দৈব চয়নের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় মনে হচ্ছে এর মধ্যেও কতগুলো বিশেষ প্রবণতা দেখা দেয়। মানুষের প্রজনন কোষে ডিএনএ সম্ভারের মাত্র ৫ শতাংশের মধ্যেই এই প্রক্রিয়াটি অধিক হারে ঘটে, অন্যত্র তেমন নয়। আরো দেখা গেছে যে ডিএনএর কোন কোন অংশে এরকম জোড়া-তালির ঘটনা অন্য জায়গার চেয়ে অনেক বেশি ঘটে। এই প্রবণতাগুলো ডিএনএ বিবর্তনের মাধ্যমে শিখে নিয়েছে নিজের স্বপক্ষে ব্যবহারের জন্য।

হ্যাঁ, ঐ 'পিচ্ছিল' হবার বা 'কাটিং-পেষ্টিং' হবার প্রবণতাগুলো কোথায় কিভাবে থাকা উচিত তা ডিএনএ 'শিখেছে'। বিবর্তন প্রক্রিয়ারই ভেতর দিয়ে এবং তার

ভেতরে অনুকূল বা প্রতিকূল হবার উপর নির্ভর করে সম্ভাবনাগুলো ঠিকই কাজ করেছে বটে, কিন্তু বৈচিত্র সৃষ্টির আটপৌরে ব্যাপারটি কিন্তু এর ফলে আর নেহাৎ দৈবের উপর নির্ভর করছেনা। এজন্য

ডিএনএর ঐ ঐতিহাসিক ভাবে শেখার ঘটনাটিকে, এর বুদ্ধিমান হবার ব্যাপারটিকে, আমাদের সম্মান করতে হবে, সব স্তরেই দৈব বলে, অনিশ্চিত বলে খাটো করে দেখা যাবে না। নইলে আমরা ডিএনএর 'নষ্ট' জিন মেরামত করতে গিয়ে নিজেরই বিপদ ডেকে আনতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাটি হওয়া উচিত কারিগরের বা ডাক্তারের মত যতটা না, তার চেয়ে বেশি ছাত্রের মতই। ডিএনএ থেকে আমরা যাতে শিখতে পারি সেই মনোভঙ্গীটিই আমাদের বেশি থাকা উচিত, ডিএনএর উপর কারিগরি বা ডাক্তারী করার চেয়েও।

গাছের অনুভূতি

কথায় বলে নির্বিকার কোন লোককে কিছু বলা আর গাছকে বলা একই সমান। আসলেই কি গাছ অনুভূতিহীন? এ সম্পর্কে নিবিড় গবেষণা প্রথম করেছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু আমাদের বিক্রমপুরের সন্তান। কোন উত্তেজক পীড়নে গাছের সাড়া পরিমাপের জন্য জগদীশ চন্দ্র যে সব সরল অথচ সূক্ষ্ম যন্ত্র উদ্ভাবন করে গিয়েছেন আজও তা পথিকৃতের কাজ হিসাবে স্মর্তব্য। এগুলোর মাধ্যমেই তিনি দেখিয়েছিলেন কি ভাবে গাছ যান্ত্রিক পীড়নে, ক্ষত করাতে বা রাসায়নিক উত্তেজকের প্রভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। তিনিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন গাছের অব্যক্ত বেদনা অনুভূতির দিকে। সর্বসাধারণের জন্য এ বিষয়ে বাংলায় লেখা তাঁর বই 'অব্যক্ত' বাংলা সাহিত্যের এক চিরায়িত সম্পদ।

বিষয়টি আবার ফিরে এসেছে বিজ্ঞানীদের গবেষণায়। গাছের পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে সাম্প্রতিক কালে প্রচুর কাজ হয়েছে। দেখা গেছে প্রাণির মত উদ্ভিদকেও বেঁচে থাকার জন্য ইন্দ্রিয় অনুভূতির যথেষ্ট সহায়তা নিতে হয়। আলো দেখে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সে যথেষ্ট আলো পাচ্ছে কিন্তু লম্বা তাকে হতে হবে, ছায়া থেকে বের হতে কোন দিকে যেতে হবে। শুঁয়ো পোকা তাকে আক্রমণ করলে এতে বুঝেসুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এমনি হরেক রকম কাজে গাছের অনুভূতিকে কাজে লাগাতে হয়।

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো

গাছের চোখ নেই বটে, কিন্তু উদ্ভিদ আলোক সংবেদী। উদ্ভিদের গায়ে রয়েছে আলোক সংবেদী যৌগ সমন্বয়ে কিছু প্রোটিন। আলোর পুরো বর্ণালীই এর কাছে

ধরা পড়ে। এর মধ্যে দুরকমের ভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। ফাইটোক্রোম নামের ব্যবস্থা সাড়া দেয় বর্ণালীর লালের দিকের অংশে আর ক্রিপটোক্রোম ব্যবস্থা সাড়া দেয় অন্য দিকের অংশে নীল সবুজ থেকে কিছুটা আলট্রাভায়োলেট পর্যন্ত। প্রথম ব্যবস্থাটি আলোর গুণাগুণ পরখ করে আশেপাশের অন্যান্য উদ্ভিদ প্রতিযোগীদের টেক্কা দিয়ে কি রকম আলো সে পাচ্ছে তা দেখে। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি ঠিক করে কখন রাত, কখন দিন? দিনের দৈর্ঘ্য কত, কত আলো কোন্ দিক থেকে আসছে।

নিউইয়র্কের রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ফাইট্রোক্রোম নামের এক ধরনের পদার্থ অঙ্কুরিত বীজ থেকে সদ্য গজানো চারা মাটি ফুঁড়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পর্যায়ের আগে পর্যন্ত উদ্ভিদ চলে বীজের মধ্যে সংরক্ষিত শক্তির দ্বারা। মাটির উপর উঠে বীজ পত্র মেলে দিয়ে সালোক সংশ্লেষণ শুরু করার পর থেকে সে চলে আলোর শক্তিতে। ফাইটোক্রোম এই পরিবর্তনের ব্যবস্থাটি করে দেয়। ফাইটোক্রোম-বি কিন্তু করে অন্য একটি কাজ। সরাসরি সূর্যের আলো যখন গাছ পায় তখন তাতে বর্ণালীর নিকট লালের অংশটির প্রাধান্য থাকে। কাছাকাছি অন্য গাছের বাধা পেয়ে সেখান থেকে ঠিকরে যে আলো পায় তাতে দূর লালের অংশটিই শুধু থাকে। ফাইট্রোক্রোম-বি এই দুইয়ের তুলনামূলক তীব্রতা বুঝতে পারে এবং সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নেয় যে অন্য গাছ দিয়ে প্রয়োজনীয় আলো কতখানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এটি বুঝার পরেই গাছ প্রতিযোগীকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বিনিয়োগ করে, তার আগে নয়।

উদ্ভিদ সূর্যের আলোতে ক্ষতিকর আলট্রা ভায়োলেটের প্রতিও সংবেদী। এই সংবেদনের জন্য দায়ী আণবিক অংশটি যদিও এখনো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি, দেখা গেছে যে গায়ে আলট্রাভায়োলেট বেশী পড়লে উদ্ভিদ কোয়েরসিটিন ও কেম্ফেরোল নামে দুটি বর্ণহীন প্রতিরক্ষা আবরণী তৈরী করে যা আলট্রাভায়োলেট ফিল্টার করে নিতে সক্ষম। সাগরতীরে গিয়ে নাজুক চামড়ার সান-বার্নিং এড়াতে মানুষকে গায়ে সান-ট্যান ক্রীম মাখতে হয়। উদ্ভিদ নিজের জন্য সেটি নিজেই তৈরী করে নেয়।

সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো হচ্ছে প্রধানত জেনেটিক পর্যায়ে কি ধরনের সাড়া দেবার জন্য উদ্ভিদকোষের কোন্ জিনটি দায়ী সেটি নির্ণয়ের মাধ্যমেই সাড়ার প্রকৃতিটিকে আলাদা করা সম্ভব হচ্ছে। অধিকাংশ পরীক্ষাগুলো চলছে শাক জাতীয় একটি অতি সাধারণ উদ্ভিদ থেইল ক্রেস (এরাবিডোপসিস থালিয়ানা) এর উপর। এর সুবিধা হচ্ছে এর সারল্য আর স্বল্প আয়ুস্কাল। জিন কারিগরির মাধ্যমে এই উদ্ভিদের বিভিন্ন মিউট্যান্ট (পরিবর্তিত প্রকার) সৃষ্টি করে তার মধ্যে এমন একটিকে বাছাই করা হয়

যাতে একটি বিশেষ সাড়া দেবার গুণ কমতি থাকে। কোন্ জিনটির অভাবে এটি হচ্ছে তা এখন নির্ণয় করা সহজ হয়।

স্বাদেই পরিচয়

'আমার খাবার কই, আলো বাতাস খেয়ে বাঁচবো নাকি?' এই অনুযোগ আমরা করতে পারি, তবে গাছ অনেকটাই আলো-বাতাস খেয়েই বাঁচে। তারপরও অবশ্য গাছের আরো কিছু লাগে, আর সেটি আসে মাটি থেকে শিকড়ের মধ্য দিয়ে। মাটির মধ্যে কোথায় একটি সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা রয়েছে তা শিকড়কে খুঁজে নিতে হয়। আর উদ্ভিদ এ কাজটি করে মাটির স্বাদ নিয়ে।

বৃটেনের শস্য-গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে উদ্ভিদের এমন একটি জিন রয়েছে যা তাকে মাটির পরীক্ষা করে কোন্ মাটিতে নাইট্রেট ও এমোনিয়াম লবণ বেশী আছে তা নির্ণয়ে সক্ষম করে। যেদিকের মাটিতে এই জরুরী জিনিষগুলো বেশী থাকে শিকড় সেদিকে বাড়ে। তা না করে যত্রতত্র যে কোন দিকে শিকড় প্রসারণ করাটি সম্পদ ও শক্তির অপচয়- এটি উদ্ভিদও জানে।

এর আবিষ্কারও হয়েছে অনেকটা একই পদ্ধতিতে। থেইল ক্রেসের বেশ কিছু মিউট্যান্ট তৈরী করে এমন একটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে সেটি মাটির স্বাদ নিতে পারেনা, কাজেই প্রধান শিকড় থেকে কোন্দিকে শাখা-শিকড় বিস্তার করবে তা বুঝতে পারেন। এভাবে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে ANR-1 নামক একটি জিনের অনুপস্থিতি এর জন্য দায়ী।

স্বাদ যে সব সময় আসল জিনিসটারই নিতে হবে এমন কথা নেই। ঐ জিনিসের উপজাত অন্য কিছু থেকেও টের পাওয়া যেতে পারে তার উপস্থিতি। কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যারা অন্য উদ্ভিদের খাবার চুরি করে। আগাছা হিসাবে এরাই কুখ্যাত। যেমন অফ্রিকার একটি উদ্ভিদ ষ্ট্রিগা ভাইনী আগাছা নামে পরিচিত। কারণ বিস্তীর্ণ কৃষিযোগ্য জমিতে এটি শস্যের পানি আর জরুরী পুষ্টি চুরি করে মাটির ভেতরে তার শিকড়ের মাধ্যমে ভুট্টা, সরগম ইত্যাদি শস্যের। শিকড় থেকে নিঃসৃত কিছু যৌগের স্বাদ পায় এই ভাইনী আগাছার সুপ্ত বীজ। তার পরেই শুধু এটির অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং ঐ যৌগগুলোকে পথ প্রদর্শক হিসাবে ব্যবহার করে শস্যের শিকড়ের দিকে এগিয়ে যায় ও তার রস শুষে খায়।

না সব কিছু এরকম ভাইনীর মত ভয়াবহ নয়। অনেক সময় উদ্ভিদ নিজের আত্নরক্ষার জন্যও স্বাদের উপর নির্ভর করে। শুয়াঁপোকারা বহু উদ্ভিদের পাতা খেতে ভালবাসে কে তার এই ক্ষতি করছে তা উদ্ভিদ টের পায় ঐ শুয়াঁপোকার

মুখের লালার স্বাদ নিয়ে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে যে ভুট্টা, বীট আর তুলা গাছের পাতা বীট আর্মিওয়ার্ম মথের শুঁয়াপোকার আক্রমণ ঘটলে এক ধরনের উদ্বায়ী পদার্থ নিঃসরণ করে, যা ঐ শুঁয়াপোকার শত্রু এক রকম বোলতাকে আকৃষ্ট করে। দেখা গেছে যেই শুঁয়াপোকা পাতা খেতে আরম্ভ করে তার লালায় ভোলিসিটিন নামের একটি পর্দাথ উদ্ভিদের স্বাদে ধরে পড়ে। এর ফলেই উদ্ভিদ বিপদ সংকেত হিসাবে সেই উদ্বায়ী বস্তু নিঃসরণ করতে পারে।

গন্ধে গন্ধে

স্বাদ নিয়ে বিপদ বুঝতে বুঝতে সময় লেগে যায়। ইতিমধ্যে আক্রমণ ঘটে গেলে তবেই তার স্বাদ পাওয়া যায়। আরো ভাল হতো যদি আক্রমণ ঘটার আগেই উদ্ভিদের কোন ইন্দ্রিয় অনুভূতি তা বুঝে ফেলতে পারতো। বেশ কয়েক বছর ধরে গবেষণায় ঠিক এরকম ব্যাপারটি দেখা যাচ্ছে।

১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ষ্টেট ইউনিভার্সিটির কয়েকজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে টমেটো গাছের পাতাকে মিথাইল জেসমোনেট নামক জিনিস দিয়ে রাঙিয়ে দিলে, ওর রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা হয়। পরে বুঝা গেলে এভাবে রাঙ্গানোর দরকার হচ্ছেনা, একটা গাছে আক্রমণ ঘটলে আশপাশের সব গাছে ঐ প্রতিষেধক জেগে উঠছে। গবেষণায় ধরা হলো যে গাছ আহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওতে মিথাইল জেসমোনেট নিঃসৃত হচ্ছে আর প্রতিবেশী গাছগুলো এর গন্ধের মাধ্যমে আগে থেকেই খবর পেয়ে যাচ্ছে সেগুলোতেও প্রতিষেধককে জাগিয়ে দিচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো অনেক সুগন্ধিদ্রব্যেও এই মিথাইল জেসমোনেট ব্যবহৃত হয়। কয়েকবার এমনও হয়েছে যে গবেষকদের কারো গায়ে এই সুগন্ধি থাকলে তাতে আপনা আপনি গাছ সতর্ক হয়ে যাচ্ছে; পরীক্ষণে বিপত্তি ঘটছে।

সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে উদ্ভিদ ধোঁয়ার গন্ধও বুঝতে পারে। মনে করা হচ্ছে যে, আগুন দিয়ে যখন বন পরিস্কার করা হয়, বা জমিতে শস্যের নাড়া পুড়িয়ে দেয়া হয়,তখন মাটিতে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকা বীজের অংকুরোদগম হয় ধোঁয়ার গন্ধের প্রভাবেই। দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু গবেষণায় আরো সীমিত পরীক্ষণে ল্যাটুস, সেলারী এবং রেড়ির তেলবীজের উপর ধোঁয়ার কিছু যৌগ সম্পৃক্ত পানি প্রয়োগ করে সেগুলোকে অন্ধকারে অংকুরিত করা সম্ভব হয়েছে। এর থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রক্রিয়ায় শস্য চাষ শুরু করার আগেই মাটিতে লুকিয়ে থাকে আগাছা বীজগুলো অংকুরিত করে এদের চারাকে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য করা যাবে। এখন আগেভাগেই আগাছানাশক দিয়ে অথবা চাষ করে মিশিয়ে দিয়ে এদের নষ্ট করে ফেলা সম্ভব হবে।

পরশের আবেশে

অনুভূতির কথা থেকে লজ্জাবতীর কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। গাছের অনুভূতি এর চেয়ে স্পষ্ট ও তাৎক্ষণিক প্রমাণ আর কিছু হতে পারেনা। হাতের বিন্দু মাত্র ছোঁয়ায় কেমন করে লজ্জাবতীর পাতাগুলো নুইয়ে পড়ে। সেটি অন্তত এই গাছটির খুব তীক্ষ্ণ স্পর্শ অনুভূতির কথা জানিয়ে দেয়। কিন্তু উদ্ভিদের পরশ বুঝতে পারার ক্ষমতার আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। শিম গাছ যে ভাবে তার অবলম্বন কাঠিকে দেহ থেকে বের করা সরু আঁকড়া দিয়ে প্যাঁচিয়ে ধরে সেটি স্পর্শ করে কাঠিটির অবস্থান, পুরুত্ব ইত্যাদি বুঝে বুঝেই সম্ভব। এই সাধারণ উদাহরণ ছাড়াও রয়েছে অসাধারণ কিছু বিখ্যাত উদাহরণ। যেমন ভেনাস ফ্রাইট্র্যাপ নামের পতঙ্গ-খেকো উদ্ভিদ পোকার জন্য ফাঁদ পেতে রাখে। ফাঁদের উপর যেই পোকা এসে বসে স্পর্শ অনুভূতি দিয়ে তা টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে একে আটকে হজম করার প্রক্রিয়া শুধু এটি।

উল্লেখিত বিভিন্ন স্পর্শকাতরতার পেছনে বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া কাজ করে আর এই প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কারের গবেষণা এখন যথেষ্ট এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন যে স্পর্শ অনুভূতি আসলে সব উদ্ভিদেই রয়েছে। যে সব উদ্ভিদে এগুলো বেশী প্রকট নাটকীয় রূপ লাভ করে সেগুলো আমরা বেশী দেখি।

কম প্রকট রূপে স্পর্শ অনুভূতি উদ্ভিদকে অন্যান্য নানাভাবে সাহায্য করে। যেমন এই অনুভূতি থেকেই গাছ বুঝতে পারে জোরালো বাতাস কোন দিক থেকে আসে। বেশী হেলে পড়া প্রতিরোধ করার জন্য গাছ সেই হিসাবে তার কান্ডের প্রয়োজনীয় কোষকলাকে দৃঢ় করে নেয়। এভাবে দৃঢ় করতে গাছকে বেশ কিছু অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করতে হয় যা সব দিকে সমান ভাবে করতে হলে অপচয় হতো। শক্তি যে ব্যয় করতে হয় তার প্রমাণ স্বরূপ দেখা গেছে ভুট্টার ক্ষেতে প্রতি দিন মাত্র ৩০ সেকেন্ডও যদি জোরালো বাতাস বয়, তা হলে সেই ভুট্টার ফলন ৩০ থেকে ৪০ ভাগ কমে যেতে পারে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় মনে হচ্ছে যে বাতাসের গতি বুঝতে পেরে কান্ড শক্ত করার প্রক্রিয়াটিতে ক্যালশিয়ামের একটি ভূমিকা রয়েছে। স্পর্শে বাতাসের চাপ অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ কোষের ভ্যাকুয়োলগুলোতে জমানো ক্যালশিয়াম কোষ রসে ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাপারটি বুঝতে পারার জন্য বিজ্ঞানীরা এমন একটি উপর অবলম্বন করেছেন যা রীতিমত চমকপ্রদ। সামুদ্রিক প্রাণির দেহে রয়েছে ক্যালশিয়াম সংবেদী একরকম প্রোটিন যা ক্যালশিয়ামের সংস্পর্শে জ্বলে উঠে আলো বিচ্ছুরণ করে। ঐ প্রোটিন সৃষ্টির জিনটি বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ কোষে প্রতিস্থাপন করেছেন যাতে যখনই ক্যালশিয়ামের চলাচল হলেই উদ্ভিদটি জ্বলে উঠবে। দেখা

গেছে সামান্য স্পর্শে এমন কি এর সামান্য বাতাসের স্পর্শেই উদ্ভিদ এভাবে জ্বলে উঠছে। স্পর্শ হবার পর ক্যালশিয়ামের ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে বড় জোর এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ। সব কিছু অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘটে যায়। এই ক্যালশিয়ামেই কোষ দেয়া দৃঢ় করার জন্য দায়ী জিনগুলোকে সক্রিয় করে তোলে। টেক্সাসের রাইস ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা এভাবে কান্ড দৃঢ় করার জন্য পাঁচটি জিনকে চিহ্নিত করেছেন এবং এগুলোর নাম দিয়েছেন টাচ্ জিন অর্থাৎ স্পর্শ জিন সংক্ষেপে TCH জিন।

আমি কান পেতে রই

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা কয়েক বছর আগে এক চমকপ্রদ পরীক্ষার ফলাফল পেয়েছেন। এর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে শব্দের সাহায্যে গাছের অধিক ফলন ফলানো যায় এ ধরনের জনশ্রুতিটি ভিত্তিহীন নাও হতে পারে। তাঁরা এমন একটি যন্ত্র ব্যবহার করেছেন যার থেকে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে পাখির কিচিরমিচিরের মত শব্দ তৈরী করতে পারে। মটরশুটির ছোট চারার উপর এ শব্দ প্রয়োগ করে তাঁরা দেখেছেন শব্দ যখন ২ কিলোহার্ৎস ফ্রিকোয়েন্সির এদিকে সামান্য ওদিকে সামান্য এমন খাদের– সেটি কিনা মানব কণ্ঠের খাদের মতই, আর তার জোর যখন ৭০ থেকে ৮০ ডেসিবেলের মধ্যে যা কিনা মানুষের স্বাভাবিক কথাবার্তার চেয়ে কিছুটা মাত্র চড়া, তখন চারার বৃদ্ধি বেড়ে যাচ্ছে শুধু তাই নয়। ফ্রিজে রাখা কিছু পুরানো মূলাবীজ নিয়ে তাঁরা দেখেছেন এদের অংকুরোদগমের হার শতকরা ২০ ভাগের বেশী নয়। অথচ এঁগুলোকেই ঐ রকম শব্দের মধ্যে রাখলে এ হার ৮০ থেকে ৯০ তে পরিণত হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা আন্দাজ করছেন উদ্ভিদের একটি হরমোন জিবেরেলিক এসিড, যা কান্ডের বৃদ্ধি, বীজের অংকুরোদগম ইত্যাদিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে, এবং সেটি শব্দ শুনতে পারার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এ রকম মনে করার কারণ হচ্ছে জিবেরেলিক এসিডের সংশ্লেষণে বাধা দেয় এমন রাসায়নিক দ্রব্য মটরশুটি চারায় প্রয়োগ করলে তখন কিন্তু সে আর শব্দ শুনতে পারেনা, কারণ তখন তার উল্লিখিত বৃদ্ধির হার আর থাকেনা। এটি জানা রয়েছে যে জিবেরেলিক এসিড পাতার মধ্যেই সংশ্লেষিত হয়ে থাকে। উদ্ভিদের 'কান' যদি থাকে, তা হলে সেটি পাতার মধ্যে যেখানে সহজে শব্দ তরঙ্গ আঘাত হানতে পারবে, সেখানে থাকাইতো স্বাভাবিক।

জগদীশ বসু কাজটি শুরু করেছিলেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম পরিমাপে তিনি উদ্ভিদের সংবেদনশীলতাকে সর্ব সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। আজ কোষের অভ্যন্তরে ডিএনএ'র ভাষায় উদ্ভিদের ইন্দ্রিয় অনুভূতি আর অতোটা 'অব্যক্ত' নয়।

জেইন গুড-অলের
অন্য সংসার

তরুণী জেইন গুড-অল কাজটি নিয়েছিলেন নেহায়েৎ কৌতুহলবশত। এ কাজে তাঁর তেমন কোনো বিদ্যা বা প্রস্তুতি ছিল না। বিখ্যাত নৃ-প্রত্নতত্ত্ববিদ লিকি দম্পতির অনুরোধে মধ্য আফ্রিকায় শিম্পাঞ্জিদের জীবনধারা পর্যবেক্ষণের এই

কাজে জেইন এভাবেই এসেছিলেন– অল্পকিছু দিন এই অদ্ভুত ধরনের কাজটি করবেন এই ছিল ইচ্ছা– বড়-জোর বছরখানেক। কিন্তু বিধি জেইনের জন্য লিখেছিল ভিন্ন এক ভবিষ্যৎ। সেই যে শিম্পাঞ্জিদের জগতে ঢুকলেন সেখানেই রয়ে গেলেন পুরোটা জীবন। সারা দুনিয়া তাঁকে চেনে বিপন্ন শিম্পাঞ্জিকুলের অভিভাবক হিসাবে– জীবনব্যাপী সাধনায় অন্য যে সংসার তিনি গড়ে তুলেছিলেন ওদের নিয়ে সে জন্য।

সংসারটি যে শুধু ব্যাপক অর্থে পুরো শিম্পাঞ্জিকুলকে নিয়ে তা নয় কিন্তু। সত্যি-সত্যি জেইনের অন্তরঙ্গ একটি বিশেষ শিম্পাঞ্জি-পরিবার ছিল। যদিও একেবারে একান্নবর্তী পরিবার সেটি ছিল না– বেশ কয়েক পুরুষ ধরে একই এলাকার একই জোটবদ্ধ একটি বৃহত্তর শিম্পাঞ্জি পরিবারের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন জেইন– মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে। ওরা কিন্তু শুরু থেকেই জেইনকে আপন করে নেয় নি। এ জন্য তাঁকে অনেক খাটতে হয়েছে। প্রথমে তিনি উপলদ্ধি করেছেন ওখানে একটি শিম্পাঞ্জি দলের উপস্থিতি। তরে থেকে, নিজকে লুকিয়ে রেখে লক্ষ্য করেছেন তাদের আচার-আচরণ– ওদের মধ্যে কে কোন জন, কার কী অভ্যাস বোঝার চেষ্টা করেছেন।

সকালে যখন ঐ পরিবারের সবাই রাতের আবাস ছেড়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে, জেইন তখন খুব সাবধানে উঠেছেন গাছ বেয়ে অনেক উপরে– যেখানে অনেক গাছের ডালপাতা একাকার হয়ে তৈরি হয়েছে পাতার শামিয়ানা। অবাক হয়েছেন দেখেছেন শিম্পাঞ্জিদের অতিযত্নে পাতা বিছানা। সরু ডাল আর নরোম পাতা সংগ্রহ করে নিচের শক্ত ডালের ভিত্তির উপর সুন্দর করে সাজিয়ে কেমন করে ওরা বানিয়ে রেখেছে এক-একজনের জন্য আরামপ্রদ আর নিরাপদ বিছানা। জেইন নিজেও শুয়ে দেখেছেন সেখানে। জেইন দেখলেন শিম্পাঞ্জিদের পারিবারিক গোষ্ঠীটি খুব স্পষ্ট। কয়েক জন বয়স্ক পুরুষ রয়েছে এতে, তবে পরিবারপ্রধান একজনই– আলফা পুরুষ। তার সর্দারি চালচলন, সবাইকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা এবং বিশেষ করে পরিবারের সব স্ত্রীকে কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় আলফা পুরুষ কোন জন। দাপট বেশি আলফা পুরুষের হলেও, হৈচৈটা অন্যান্য পুরুষের বেশি দেখা গেলেও, পরিবারের আসল সংবদ্ধকারী কিন্তু এর স্ত্রী কয়েক জন। ছোট শিশু থেকে শুরু করে চার-পাঁচ বছরের ছেলেমেয়ের দলকে যত্নে আগলে রেখে তারাই পরিবারের ভিত রচনা করে। পরিবার-প্রতিপালনে পুরুষদের আগ্রহ তেমন নেই– এমন কি আলফা পুরুষেরও না। নির্দোষ প্রাণবন্ততায় কিন্তু এগিয়ে আছে পরিবারের কিশোর-কিশোরীরা। ওরা দলাদলিতে তেমন নেই– কাউকে ভয়ও দেখাচ্ছে না, কাউকে বিরক্তও করছে না– নিজেদের

মধ্যে খেলছে, মিছামিছি মারামারির ভান করছে, আবার মিলেমিশে আনন্দ করছে। তবে নবজাতক শিশুই হোক আর কিশোর-কিশোরীই হোক সবার সবচেয়ে বড় বন্ধন কিন্তু মায়ের সঙ্গে। শেষ অবধি তারা কিন্তু মাকে আকড়ে থাকছে, এদিক-ওদিক গেলেও ফিরে আসছে বারবার মায়ের কাছাকাছি। মা এদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছে, শিশু-বয়সে দুধ দিচ্ছে, তারপর পইপই করে বুঝিয়ে দিচ্ছে– কেমন করে নিরাপদে থাকতে হয়, খাবার যোগাড় করতে হয়, সঠিক আচরণ করতে হয়।

বহু দিন কেটে গেল এসব আড়ালে থেকে দেখে। তারপর একদিন ভাঙল অপরিচিতির বাধা। ওরা কাছে আসল, জেইনের অতিনিকট উপস্থিতিতেও ঘাবড়াল না– বরং তারা যা করছিল করেই চলল। তারও কিছু পর নৈকট্য আরো বাড়ল। এত দিন জেইনই ওদের কাছে গিয়েছেন, এবার ওরাও তাঁর কাছে আসা শুরু করল। বনের ধারে যে বাসায় জেইন থাকতেন সেখানে শিম্পাঞ্জিদের আনাগোনা শুরু হল। তাদের জন্য কলার কাঁদি মজুদ রাখতে ভুলতেন না জেইন। আসলে জেইনের আবাস আর ওদের আবাস একাকার হয়ে গিয়েছে আস্তে-আস্তে।

এত দিন জেইন ওদেরকে দেখেছেন পরিবার-গোষ্ঠী হিসাবে। এখন পরিবারের এক-এক জন সদস্যই তাঁর কাছে দেখা দিল নিজ-নিজ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে, দুজন মানুষ যেমন একরকম হয় না– না দেখতে, না আচরণে, না চরিত্রে। জেইন তাদের প্রত্যেককে নিজের মতো করে নামও দিলেন। আমরা অবশ্য জেইনের মূল নামগুলো বদলে আমাদের দেশি নাম করে দিলাম এখানে– তাদের ব্যক্তিত্বগুলো আমাদের পাঠকেরও আরো কাছাকাছি আনতে।

জেইনের বিশেষ প্রিয় পাত্রী ছিল মেয়ে শিম্পাঞ্জি আদুরি। যখন পরিচয় হল তখন সে কিশোরী মাত্র। জেইনের চোখের সামনে সে মা হল। পাঁচ বছর ধরে পর-পর সন্তান এসে বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়েকে সে এখন আগলে রাখে। ছোটটা তো সব সময় তার বুকে পিঠে আকড়ে থাকে। যে কোনো পরিস্থিতিতে, ছুটে যাবার সময়ও সন্তানটি কিন্তু বুকে-পিঠে থাকেই। বাচ্চাগুলো কম বিরক্ত করে না। ডালে-ডালে ঝোলাঝুলি করে এমন কাণ্ড বাধায় যাতে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আঘাত পেতে পারে। আদুরি সব সময় শঙ্কিত থাকে এদের জন্য বকাঝকা করে, চড়থাপড়ও দেয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

জেইন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন নতুন বাচ্চার প্রতি বড় বোন বা অন্যান্য কিশোরীর আগ্রহ আর কুতুহল। সারাক্ষণ বাচ্চার পাশে বসে থাকে এরা, আদর করে, কোলে নিতে চায়, অবাক বিস্ময়ে তার প্রত্যেকটি নড়াচড়া দেখে। আদুরি তাতে আপত্তি করে না বটে, কিন্তু বাচ্চাকে বেশি ঘাটাঘাটি করলে বা টেনে নিতে চাইলে বাধা দেয়, কখনো ওখান থেকে অন্যত্র চলে যায়। একটু বড় হলে এ বাচ্চাও মাকে জ্বালাতনের কাজে যোগ দেবে– এটা চাই, ওটা চাই। আদুরির কিন্তু ধৈর্য কম নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আবদারগুলো রাখার চেষ্টা করে। একটি বিষয় কিন্তু খুব স্পষ্ট। বাচ্চারা পদে-পদে মাকে অনুকরণ করতে চায়। মার কাছেই তারা শিখছে কেমন করে নিরাপদে এক ডাল থেকে অন্যটিতে লাফিয়ে যেতে হয়। কোন ফল-পাতাগুলো নিরাপদে খাওয়া যায়। আসলে শিম্পাঞ্জির বাচ্চা ৪/৫ বছর বয়স পর্যন্ত ও মায়ের দুধ খেতে চায়। তবে ইতোমধ্যে অন্য খাবারেও তারা অভ্যস্ত হয়। মূলত গাছ-গাছড়া থেকেই তাদের এ খাবার আসে– ফল, পাতা, বীজ ইত্যাদি। উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে বলে তাদেরকে প্রচুর খেতে হয়। মায়ের দুধ ছেড়ে দেয়ার পর তাদেরকে তো দিনের প্রায় সত্তর ভাগ সময় ঐ খাবার খেতেই কাটাতে হয়।

আদুরির বাচ্চারা মায়ের কাছে যা-যা শিখছে তার মধ্যে একটি বড় জিনিস হল আলফা-পুরুষ বাহাদুরের সঙ্গে বুঝেসুজে চলা। জেইন অন্তত নয়-দশ বছর ধরে দেখছেন যে বাহাদুর ঐ পদটি দখল করে আছে। পরিবারে সবার উপর তার কর্তৃত্ব, সবাই তাকে সমীহ করে চলে। বাচ্চা কাচ্চা যেগুলো পরিবারের বিভিন্ন স্ত্রী-

শিম্পাঞ্জিদের হচ্ছে তারও বেশির ভাগই তার। অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী পুরুষ পরিবারের ভেতরেই আছে– যারা সুযোগ পেলেই বাহাদুরের জায়গায় আলফা-পুরুষ হতে চাইবে। বাহাদুর তার কর্তৃত্বটি রক্ষা করে তার সুগঠিত বলশালী দেহ নিয়ে প্রায়ই আক্রমণাত্মক নর্তনকুর্দন করে। এতে চ্যালেঞ্জকারী পুরুষ ক'জন একটু কাবু হয়ে থাকে। তবে শক্তির প্রদর্শনটাই সব কিছু নয়। বাহাদুরের মধ্যে কূটনৈতিক চালেরও অভাব হয় না। অধিকাংশদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে চায়। এ কাজে তার বিশেষ সহায়ক জ্ঞাতি ভাই ও বন্ধু রাখী। রাখী নিজেই আলফা-পুরুষ হবার একজন দাবিদার ছিল, কিন্তু বাহাদুরের সঙ্গে শক্তির লড়াইয়ে পেরে ওঠেনি। এখন সে বাহাদুরের নিত্যসঙ্গী। তাকে দলশাসনে সাহায্য করে– সেই সঙ্গে নিজেও ক্ষমতার কিছু সুযোগ-সুবিধা নেয়, বিশেষ করে নিরীহ স্ত্রী শিম্পাঞ্জিগুলোর থেকে। বেশির ভাগ বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীদেরকে নিজের পক্ষে রাখাটিও এ কাজে কম জরুরি নয়। বাহাদুরকে নিজের দলের উপর যেমন কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হয়, তেমনি কাছাকাছি অন্য দলের উচ্চাকাঙ্খক্ষী পুরুষদের থেকেও নিজের হেরেমকে রক্ষা করতে হয়। যে ক্ষেত্রেও তার নিজ পরিবারের সমর্থন প্রয়োজন হয়। অবশ্য ভীতিপ্রদর্শনই হল তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এ জন্য সত্যিকার লড়াই করার চেয়েও জরুরি হল বন-কাঁপানো হৈচৈ তোলা। অন্য আলফা-পুরুষদের মতো বাহাদুরও এটি নিত্য করে থাকে। তার অঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দুপদাপ করে বেড়িয়ে–প্রচণ্ড বিকট আওয়াজ, ডালপালা ভেঙে এ গাছ থেকে দ্রুত ঐ গাছে লাফিয়ে, একে-ওকে দুপদাপ করে তাড়া করে বাহাদুর তার শক্তি প্রদর্শন করে। অবশ্য একবার এটি করে সবাই যখন ভীত জড়োসড়ো হয়ে পড়ে, চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন পুরুষগুলো যখন দূরে চলে যায়, আর বিশেষ করে বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে মায়েরা যখন নিরাপদ স্থান খোঁজে– তখন বাহাদুর আবার শান্ত মূর্তি নিয়ে এসে তাদের আশ্বস্ত করে, খুব কাছে এসে কাউকে-কাউকে আদরও করে, যাতে পরিবার আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

পরিবারের অন্যান্য উচ্চাকাঙ্খক্ষী পুরুষও মাঝে মাঝে বাহাদুরের মতো শক্তি প্রদর্শনে কার্পণ্য করে না। তাদের মধ্যে একজনের আচরণটি বিশেষভাবে মজার, সে হল ভুলু। ভুলুর শরীর অত বড়সড় নয়, শক্তিও কম। কিন্তু বুদ্ধিতে সে ওটা পুষিয়ে নেয়। জেইনের বাসার বাইরে কয়েকটি খালি কেরোসিনের টিন পড়েছিল। ওর মধ্য থেকে ভুলু দুটি দখল করে নিয়ে গেছে। এখন বাহাদুরের সঙ্গে শক্তি প্রদর্শনের লড়াই যখন বাধে ভুলু তখন সমানে ঐ দুটি টিনে পরপর লাথি মেরে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দারুণ আওয়াজ তোলে। মুখে চিৎকার ও দৌড়ঝাঁপ করে বাহাদুর যে আওয়াজ তোলে টিনের ধাতব আওয়াজে ভুলু তার সাথে ভালোই পাল্লা দিতে পারে, অনেক কম শক্তি ব্যয় করে।

এতই ধুমধারাক্কা যারা করছে তারাই আবার জেইনের কাছে এসে ভেজা বেড়ালটি হয়ে যায়। ওদের কারো-কারো সঙ্গে জেইনের বেশ ভাব হয়ে গেছে। অনেকে তাকে কাছে এসে আদর করে, হাতটি ধরে বসে থাকে। বিশেষ করে আদুরি এবং তার মতো আরো কয়েক জন মায়ের সঙ্গে জেইনের খুব ভাব। শিম্পাঞ্জি-পরিবারে আদর প্রকাশের একটি সাধারণ পদ্ধতি হল চুল ও শরীর খুঁটা– মনে হবে যেন উকুন বাছছে। এটি কিন্তু উকুন বাছা নয় মোটেই। আসলে শিম্পাঞ্জিদের গায়ে পোকামাকড় তেমন কিছু থাকে না– সর্বক্ষণ লোম আঁচড়ে তারা গা পরিষ্কার রাখে। গা খুটাটা হল প্রধানত আদর ও নৈকট্য প্রকাশের একটি ভাষা। সেই সঙ্গে গায়ে এটা সেটা থাকলে তাও খুঁটে নেয়– যেমন মরা চামড়া, চোরকাঁটা, লেগে-থাকা উদ্ভিদের নানা বীজ ইত্যাদি খুঁটে-খুঁটে মুখে খেয়েও ফেলে ওরা। পরিবারের সদস্যদের দেখা যায় প্রায়ই এ ওর গা খুঁটছে খুব কাছে বসে। জেইনকেও তারা মাঝে মাঝে এই দলে নিয়ে নেয়।

তবে জেইনের জন্য এই মাখামাখি কখনো বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায়। আদুরির বড় ছেলে মধু যখন কৈশোরের পর্যায়ে তখনই তার শরীরটা বেশ বাড়ন্ত। এই ছেলেটি মনে হয় কিছুটা জড়বুদ্ধির– প্রায়ই এমন কিছু করে যা অন্য শিম্পাঞ্জিরা করে না, তার বয়সেও। সে ক্ষণে শান্ত, ক্ষণে আবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার মতিগতি বোঝা বড় দায়। মাঝে মাঝে সে খুব শান্তশিষ্ট হয়ে জেইনের কাছে এসে বসে, তার হাতখানি দু হাতে চেপে রাখে, কিংবা গলা জড়িয়ে ধরে। হঠাৎ কোনো একটি উছিলায় আবার তার মেজাজ বিগড়ে উঠলে জেইন তার আক্রমণের সম্মুখীন হন। একবার তো পেছন দিক থেকে তাঁর ঘাড়ের উপর এমনভাবে এসে পড়ল আর একটু হলে জেইনের ঘাড়ই মটকে যেত। বোকা মধু বুঝতে পারত না যে তার শরীরের অনেক ওজন– হালকা-পাতলা জেইনের পক্ষে তার যে কোনো আঘাত বিপজ্জনক হতে পারত।

জেইন অবশ্য শিম্পাঞ্জিদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। নবজাতককে যেভাবে তারা কোলে নেয়, দুধ খাওয়ায়, শান্ত করে, রক্ষা করে– সেটি দেখে কে বলবে এরা অবিকল মানুষ-মায়ের মতো নয়। মায়ের কোল থেকে বাচ্চা যেভাবে ড্যাব-ড্যাব করে সবাইকে দেখে– তাও অবিকল মানুষ বাচ্চার মতো। বয়সে বড় ভাইবোন বা অন্য কেউ বাচ্চাকে যখন উৎপীড়ন করে তখন তার চিৎকার, কান্না আর নালিশের ভঙ্গিটিও অবিকল মানুষের মতো। তবে সন্তান আর মায়ের মধ্যে বন্ধনের এক অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক উদাহরণ জেইন দেখতে পেয়েছেন আদুরি এবং তার এক ছেলে রাজার মধ্যে– এমনটি মানুষের কষ্টকল্পিত গল্পকেও হার মানায়।

সাধারণত তিন-চার বছর বয়সের পর শিম্পাঞ্জির বাচ্চারা মাকে আর বেশি বিরক্ত করে না। কাছে থেকেও একটু দূরে-দূরেই সরে যায়। বিশেষ করে পরের বাচ্চাটি হবার পর তো এটি অবশ্যই ঘটে। রাজার ক্ষেত্রে এটি কিন্তু হয় নি। বরং যতই সে বড় হয়েছে মায়ের কাছে তার আদিখ্যেতা বেড়েছে, বেড়েছে তার অন্যায় সব আবদারও। চার-পাঁচ বছর বয়স হয়েও সে সারাক্ষণ মাকে জ্বালাতন করত, কোল ছাড়ত না, যখন-তখন দুধ খেতে চাইত, আদর চাইত। এটি তক্ষুণি না হলে সে উৎপীড়ন শুরু করত মাকে– চিল্লাচিল্লি, হাত-পা ছুঁড়ে আঘাত করা কিছুই বাদ যেত না। কখনো-কখনো তো রীতিমতো মারমুখী হয়ে পড়ত রাজা মায়ের প্রতি। এতে আদুরির প্রতিক্রিয়া হত প্রথমে বাধা দেয়া, নিরস্ত করার চেষ্টা করা এবং শেষ পর্যন্ত রাজা যা চায় তা মেনে নেয়া। মনে হত আদুরি ইচ্ছা করেই যেন ছেলেটিকে বখে যেতে দিচ্ছে।

রাজার অত্যাচার চরমে উঠল যখন আদুরির পরের সন্তানটির জন্ম হল। এই বাচ্চাকে কোলে রাখাই মুশকিল হত তার, রাজার জন্য। রাজা কখনো-কখনো ভাইটিকে সহ্য করলে অধিকাংশ সময় তাকে নিয়ে একটি দক্ষ যজ্ঞ বাধিয়ে রাখত। ভাইটির বয়স কয়েক মাস যাবার পর একদিন জেইন তাকে আর আদুরির কোলে দেখতে পেলেন না। এর কী হয়েছে জেইন তা আর কোনো দিনই জানতে পারেন নি– এটি তাঁর কাছে একটি রহস্যই থেকে গেছে। শুধু তিনি জানেন রাজা আবার তার মায়ের কোলের একচ্ছত্র অধিকার পেয়েছে– বুড়ো খোকা হয়েও।

রাজা ছিল তার মায়ের শেষের দিকের সন্তান। তার বয়স যখন সাত-আট ইতোমধ্যেই আদুরি রোগে দুর্বল হয়ে পড়েছিল– কিন্তু মা-ছেলের নৈকট্যের অবসান হয় নি তাতে। এমনি একদিন জেইন দেখতে পেলেন বনের মধ্যে যে ঝরণার মতো ছোট নদীটি বয়ে গেছে তার পাড়ে আদুরির জীর্ণ-শীর্ণ মৃত দেহ পড়ে আছে– অর্ধেকটা পানির মধ্যে স্রোতে ধুয়ে যাচ্ছে, আর একটু দূরে শরীরে মুখ গুঁজে বসে আছে রাজা। রাত যায়, দিন যায়, রাজাকে ঐ অবস্থান থেকে নড়তে দেখা যায় না– খাওয়া-দাওয়াও বন্ধ রইল কয়েক দিন। তারপর অধিকাংশ সময় তাকে দেখা যেত শুয়ে থাকতে। দু'এক মাসের মধ্যে সে রোগে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়।

অদ্ভুত ব্যাপার হল রাজার ভাবসাব কিছুটা পরবর্তী সময়ে পেয়েছে তার এক ভাগনে। আদুরির বড় মেয়ে আলেয়ার যখন ছেলে হল দেখা গেল তার চেহারাটা হয়েছে অনেকটা তার মামা রাজার মতো। এই ছেলেটি– মোতির বায়নাক্কা হয়ে উঠেছিল ঠিক তার মামার মতো–যদিও পরিণতি অবশ্য মামার মতো হয় নি। রাজার সঙ্গে তার এই মিলের কারণে জেইন বেশ কিছু বয়স হওয়া পর্যন্ত

মোতিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে এসেছেন। তাকে যখনই দেখতেন, রাজার কথা মনে পড়ে যেত।

শিম্পাঞ্জির পরিবারটির নতুন প্রজন্মগুলোর সঙ্গেও সখ্যতা গড়ে উঠেছে জেইনের। বয়স বেড়েছে তাঁরও, কিন্তু এদের প্রতি সহমর্মিতা তাঁর বেড়েছে বই কমেনি একটুও। তাঁর শিম্পাঞ্জি-সংসারের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়েছে– গোষ্ঠী বড় হয়েছে ক্রমে-ক্রমে। ওদের মধ্যে জেইনের আনন্দিত হবার অনেক কিছু ঘটেছে। কিন্তু তেমনি অনেক দুঃখের ঘটনাও ঘটেছে। এমনি একটি দুঃখের ঘটনা হল পুরো এলাকায় শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে পোলিও রোগের প্রাদুর্ভাব। হঠাৎ করেই ভয়াবহ আকার নিয়েছে এই সংক্রামক রোগ বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে। অল্প বয়সী অনেক শিম্পাঞ্জিই এ রোগের শিকার হয়ে মারা গেছে। পঙ্গুত্বের ফলেও চলাফেরা করে খাবার যোগাড় করতে না পেরে পরে অনেকে মারা গিয়েছে। শুরু থেকেই জেইন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে চেষ্টা করেছেন এই রোগ নিবারণ করতে। কলার ভেতরে পোলিওর টিকা রেখে সেগুলো সবাইকে খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে রোগ ছড়িয়ে পড়াটা বেশ কিছু বন্ধ হয়েছে বটে–কিন্তু অনেক ক্ষতি ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। জেইনের পরিচিত অনেক শিম্পাঞ্জির মৃত্যু তাঁকে অত্যন্ত ব্যথাতুর করে তুলেছে। এই পোলিও-সংকটের মধ্যে পরিবারের একজন সংগ্রামী সদস্যের কথা জেইন কিছুতেই ভুলতে পারেন না। পোলিওতে দুপায়ে পঙ্গু হয়ে যাওয়া শিম্পাঞ্জি আতর ঐ অবস্থাতেই বড় হয়েছে এবং এই দুপায়ের ব্যবহার প্রায় ছাড়াই গাছে-গাছে বিচরণ করে খাবার সংগ্রহ থেকে শুরু করে, আত্মরক্ষা সবই করতে শিখেছে। কিছুটা হেঁচড়ে-হেঁচড়ে চলে, কিছুটা সামনের পায়ের (হাতের) ব্যবহার কৌশলে আতর অদ্ভুত কায়দায় চলাফেরা করত। এমনিভাবে আতর বহু দিন বেঁচে ছিল। যদিও এত প্রতিকূল অবস্থায় শিম্পাঞ্জির স্বাভাবিক আয়ু সে পায়নি।

বাইরে থেকে আসা দুর্যোগে যখন পরিবারগোষ্ঠীতে দুর্দশা নেমে আসে সেটি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে মেনে নেয়া যায়। কিন্তু জেইন বেশি কষ্ট পেয়েছেন মাঝে-মাঝে তাঁর শিম্পাঞ্জি-সংসারের মধ্যে কারো-কারো গুরুতর অপরাধপ্রবণতা দেখে। আদুরিরই এক আত্মীয়া লাতুরির মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন ভয়ংকর এক অভ্যাস। অন্যের নবজাত শিশু ছিনিয়ে নিয়ে মেরে খেয়ে ফেলার অদ্ভুত বিকৃত সে অভ্যাস। শিম্পাঞ্জি মায়েরা নবজাতককে এমন যত্নে আগলে রাখে যে তাকে চুরি করা সম্ভব নয়। তাই রীতিমতো যুদ্ধ করে বাচ্চা কেড়ে নিত লাতুরি। জেইন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন—কীভাবে লাতুরি তার নিজের বান্ধবী রেশমার কাছ থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লড়াই করেছে সে রেশমার সঙ্গে এই কাজে। আরো দুঃখের বিষয় হল লাতুরির এই অপকর্মের সহায় ছিল তার নিজের মেয়ে

দুলি। মায়ের অনুকরণে দুলিও পারদর্শী হয়ে উঠেছিল নবজাত সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলতে। মা-মেয়ের যৌথ আক্রমণে রেশমা শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয়েছে। ছিনিয়ে নিয়ে বাচ্চাটিকে মেরে খেতে ওদের মোটেই বেশি সময় লাগে নি। উদ্ভিদভোজী শিম্পাঞ্জির ঘরে এরকম নিজ-প্রজাতিখাদক মেয়ে দুটি কীভাবে দেখা দিল সেটিও এক রহস্য। মজার ব্যাপার হল বান্ধবীর সন্তানটিকে মেরে খাওয়ার পরই কিন্তু লাতুরির মুড বদলে গেছে– সে নিজেই গিয়ে আবার শোকাতুর মা রেশমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে গলা জড়িয়ে। ভাবখানা ঐ যা হওয়ার হয়ে গেছে, ওটা না করে আমার গত্যন্তর ছিলনা। তাই বলে আমরা বান্ধবী থাকব না তা হয় না। এই হিংস্র স্বভাবের লাতুরি অবশ্য বেশি দিন বেঁচে ছিল না। খুশির কথা হল– তার মৃত্যুর পর তার মেয়ে দুলির অভ্যাস দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। এরপর দুলি নিজে যখন মা হয়েছে এত দিনে সন্তান ছিনিয়ে নেয়া, খেয়ে ফেলা, এমনকি কোনোরকম বিরূপতা দেখানোর ছিটেফোঁটা প্রবণতাও তার ছিল না। মনে হল সব কিছু সে করত তার মায়ের প্রভাবে, মায়ের সঙ্গেই সে অভ্যাসের ইতি হয়েছে।

জেইনকে অবশ্য পরবর্তী সময়ে আরো বড় আকারের সহিংসতা দেখতে হয়েছে। তিনি একবার যখন কাজ উপলক্ষে সুদূর দার-এস-সালাম নগরে গিয়েছেন হঠাৎ একদিন টেলিফোনে সহকর্মীদের কাছ থেকে জরুরি বার্তা পেলেন তাঁর শিম্পাঞ্জিদল অন্য একটি দল কর্তৃক গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়েছে। আসলে ঐ অন্য দলটিও একই গোষ্ঠী থেকে ভাগ হয়ে গিয়ে একটু দূরে নিজেদের এলাকা গড়ে তুলেছিল। মাঝে-মাঝে দুদলে ছোটখাট খিটিমিটি হত। কিন্তু এবার যা ঘটল তা অবর্ণনীয়।

খবর পেয়ে জেইন দ্রুত ফিরে এসে যখন দেখলেন অনেক ক্ষতি তখন হয়ে গেছে। আক্রমণকারী দল নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে দুর্বলতর দলটির মধ্যে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মায়ের কোলের শিশুগুলো। আসলে তাদের মূল লক্ষ্যবস্তুই ছিল একেবারে কোলের শিশুরা। অনেক শিশু এভাবে মারা পড়ল। হয়তো শিশুদের হত্যা করে তাদের মা'দের উপর প্রাধান্য বিস্তার করাটাই ছিল উদ্দেশ্য। হত্যাযজ্ঞ আর মারপিটের পর এখানকার নেতৃত্ব-কাঠামোতে বেশ পরিবর্তন চলে এল। শান্তি ফিরল বটে তবে বেশ ক'জন আলফা পুরুষের রদবদল হল, দেখা দিল আনুগত্যের ভিন্ন ধারা।

জেইন কয়েক প্রজন্মের যেসব শিম্পাঞ্জিকে প্রায় নিজেরই সংসারের সদস্য মনে করে আসছিলেন তাদের আনন্দ-বেদনা, সুদিন-দুর্যোগের সময়ের ভেতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে অনিবার্যভাবে। এসব কিছুর মধ্যে তিনি যে জিনিসটি হারাননি তা হল মানবসদৃশ এই প্রাণীগুলোর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা, তাদের দোষগুণ

সব মেনে নিয়েই। যে জন্য ঐ শিম্পাঞ্জি মায়ের মতোই তিনি সারা জীবন লড়াই করেছেন মানুষের কারণে, পরিবেশ বিনষ্টির কারণে, ধ্বংসের সম্মুখীন এই প্রাণীটির প্রতি এবং সেই সঙ্গে সকল বন্যপ্রাণীর প্রতি মানুষের ভালবাসা জাগিয়ে তোলার কাজে। এ জন্য তিনি যে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন সারা দুনিয়ার অসংখ্য মানুষের মধ্যে সে আন্দোলন ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। তাঁর এ আন্দোলনের মূলে আছে নিখাদ ভালবাসা, অতিঅন্তরঙ্গ পরিচয় আর আত্মীয়তার ভিত্তিতে যেই ভালবাসা গড়ে উঠেছে তাঁর সারাটি জীবনব্যাপী।

বন্যকে গৃহপালনের ইতিকথা

উদ্ভিদ আর প্রাণিকে পোষ মানিয়ে তাদের কাজে লাগানোটি মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী বহু অবদান রেখেছে। আজ এরকম একটি সময় চিন্তা করাই কঠিন যখন মানুষ নিজের ব্যবহারের জন্য কোন উদ্ভিদকে চাষ করেনি, বা কোন প্রাণিকে নিজের বাধ্য করে নেয়নি। কাজটিকে আজ বেশ সহজই মনে হয়। কিন্তু মাত্র ১৩ হাজার বছর আগেও এটি অকল্পনীয় ছিল। উদ্ভিদ আর প্রাণির উপরই মানুষ বাঁচতো বটে কিন্তু সে তা শিকার বা সংগ্রহ করে নিত – নিজে উৎপাদনের চেষ্টা করতোনা, নিজে বশেও রাখতে পারতো না।

তারপর আজ থেকে প্রায় তের হাজার বছর আগে শুরু হলো সেই প্রক্রিয়া – উদ্ভব হলো কৃষির। এটি ধীরে ধীরে এসেছ, কিন্তু তাও হাতেগোণা কয়েকটি মাত্র জনগোষ্ঠির মধ্যে। অন্যদের কাছে এটি গেছে অনেক পরে – তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ পূর্ববর্তীদের মাধ্যমেই। কৃষিশক্তি নিজেই শুধু সরাসরি পরিবর্তন আনেনি মানুষের জীবনযাত্রায়, পরোক্ষভাবেও এটি এর অধিকারীদেরকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করে তুলেছে। কৃষির ফলে ওদের অনেকে দৈনন্দিন খাবার যোগাড়ের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত হয়ে এমন অনেক কিছু অর্জন করতে পেরেছে- প্রতিষ্ঠান, রাজ্য , সৈন্যবাহিনী, জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদি – যাতে দুনিয়ার চেহারাই বদলে গিয়েছে। এত বড় ঘটনা, কিন্তু তা নিজ থেকে শুরু হয়েছে পৃথিবীর কয়েকটি মাত্র স্থানে, কয়েকটি মাত্র জনগোষ্ঠির ভেতর। শুধু তাই নয়, উদ্ভিদ আর প্রাণির বৈচিত্রের মহাসমারোহের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কিন্তু অল্প কিছু মাত্র প্রজাতিই এই কৃষির বা পোষ মানানোর আওতায় ধরা দিয়েছে। বিশেষ করে প্রাণিদের ক্ষেত্রে সংখ্যা নেহাতই অল্প – আর অনেক চেষ্টা করেও আজ অবধি এই সংখ্যা

বাড়ানো যায়নি। কৃষির উদ্ভব, এর প্রভাব এবং এর সীমাবদ্ধতার কিছু কিছু বিষয় আছে যা সচরাচর আমাদের নজরে পড়েনা। এমন বিষয় নিয়েই এই প্রবন্ধ।

কৃষির অর্থে পোষ মানানো

আমরা এখানে পোষ মানানোর বিষয়টি বলছি কৃষির অর্থে। এর বাইরেও পোষ মানানোর একটি ব্যাপার আছে। বনের প্রাণিকে ধরে এনে প্রতিপালন করে তাকে ট্রেনিং দেয়া যায়। সে তখন আমাদের কিছু কিছু হুকুম তামিল করবে, এক রকম পোষ মানবে। কিন্তু তাকে গৃহপালিত পশু বলা যাবে না। বানর, হাতি, ভালুক বা এমনি আরো বেশ কিছু প্রাণিকে প্রতিপালন করে পোষ মানানো যায়, তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো যায়, কিন্তু তারা আমাদের কৃষির অন্তর্ভূক্ত হয় না আমাদের কথামত থাকার গুণগুলি তাদের মধ্যে বংশানুক্রমে দেখা দেয় না। একই কথা কোন কোন উদ্ভিদ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বন্য বীজ সংগ্রহ করে চারিয়ে বড় করলেই ওটা কৃষি হবেনা। হবে তখনই যখন ঐ উদ্ভিদ বা পশুকে বংশ পরম্পরায় চাষ করার মাধ্যমে আমরা তাদের মধ্যে একান্তই আমাদের জন্য দরকারী গুণাবলী সৃষ্টি করবো। এর ফলে ওদের সঙ্গে ওদের পূর্ব পুরুষ বন্য জাতের অনেক প্রভেদ দেখা দেয়। তখন ওদের প্রজনন প্রক্রিয়া, ওদের বেড়ে ওঠা, ফলবতী হওয়া, বিভিন্ন সক্ষমতার অধিকারী হওয়া (যেমন ভার বহন করার) এ সব ওভাবেই বংশ পরম্পরায় মানুষের ইচ্ছায় নির্বাচিত হয়ে স্থায়ীভাবে গড়ে উঠে।

মানুষ প্রথম কৃষিতে আসলো কেন?

এ প্রশ্নটিকে এখন অবান্তর মনে হতে পারে, কারণ শিকার করে বা কুড়িয়ে খাওয়ার চেয়ে কৃষির সুবিধাটি এত স্পষ্ট যে, এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু সেটা এখনকার কথা। প্রথম যারা কৃষিতে এসেছিল তাদের এর ফলাফল জানা ছিলনা। জানা যদি আদৌ থাকতই, তা হলে বরং তারা কৃষির মধ্যে ঢুকতইনা কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য থেকে আমরা দেখছি কৃষির ক্ষেত্রে প্রথম যারা ঢুকেছিল তাদের উপর এর প্রাথমিক প্রভাব শুভ হয়নি। শিকারি-সংগ্রাহকের তুলনায় তাদের কাজ অনেক বেড়েছে বৈ কমেনি। তারপরও খাদ্যের দিক থেকে তারা বরং অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়েছে। খাদ্যের বৈচিত্র্য হারিয়ে পুষ্টির অভাবে ভুগেছে তারা। বংশ পরম্পরায় দেহ তাদের দুর্বল হয়েছে, আকারও ছোট হয়েছে। রোগের আক্রমণের সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে অনেক খানি।

প্রথম কৃষি প্রচলনের ফলশ্রুতি ভাল না হওয়ার ফলে আদি কৃষক জনগোষ্ঠির আশে পাশে অন্য যে সব মানুষ ছিল তারা বরং কৃষির দিকে না গিয়ে নিজেদের শিকারি-সংগ্রাহক চরিত্রই বজায় রেখেছে। বহুকাল ধরে কৃষি সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে আদিতে গ্রহণ করেছিল এমন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠির মধ্যে।

সেখানে আদৌ এই পরিবর্তন আসলো কেন তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় অপ্রত্যাশিত ধরনের দু'রকম পরিবর্তন আসার ফলে – উদ্ভিদ ও প্রাণির মধ্যে কিছু পরিবর্তন, এবং মানুষের জীবন-আচরণের মধ্যে কিছু পরিবর্তন। প্লাইষ্টোসিন যুগের শেষের দিকে পৃথিবীর অনেক জায়গায় জলবায়ু – প্রায়শ খামখেয়ালী ও বিরূপ হয়ে উঠছিল। এমন অবস্থায় শিকার করার মত বড় বড় প্রাণির অভাব দেখা দিয়েছিল। তা ছাড়া যে সব জায়গা মানুষের বসতির অনুকূল যেখানে জনসংখ্যা বেড়ে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাচ্ছিল শিকারের ক্ষেত্রে। খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখার তাগিদে মানুষকে তখন খাদ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হয়েছে। ছোটখাট প্রাণি যেগুলো আগে সে খেতনা, এখন খেতে শুরু করলো। এমন সব উদ্ভিদের দিকেও নজর দিল যেগুলো ফলমূলের মত কুড়িয়ে সরাসরি খাওয়া যায় না। একে বেশ প্রসেসিং করে তৈরি করে খেতে হয়– যেমন শস্য ছাটাই করে, গুড়ো করে তবে খাওয়া যায়। এ সব করার সুবিধার্থে কোন কোন উদ্ভিদকে মানুষ তার বন্য অবস্থান থেকে নিজের সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে আসলো – যেখানে এগুলো আরো সহজে বাড়তে পারে। এ ভাবে স্বেচ্ছা-উৎপাদন বা চাষের ব্যাপারটি এসে গেল।

কিন্তু শুরুতে একচেটিয়া কৃষিনির্ভর গোষ্ঠি বলে কেউ ছিলনা। পাশাপাশি দুরকমের জীবনযাত্রার মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা চলছিল এ সব নব্য কৃষি গোষ্ঠিগুলোতে।

একটি জীবন-যাত্রা শিকারী-সংগ্রাহকের ভূমিকায়, অন্যটি কৃষকের ভূমিকায়। এভাবে কৃষি ব্যবস্থা চালুর পর এর মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে প্রাসঙ্গিক প্রাণি ও উদ্ভিদের মধ্যে পরিবর্তন চলে এল মানুষের হস্তক্ষেপের ফলেই—মানবিক নির্বাচনের মাধ্যমে। এসব পরিবর্তন কৃষিকে অগ্রাধিকারে আনতে সহায়ক হলো। শিকারি সংগ্রাহকের জীবন-যাত্রার উপর কৃষকের জীবন যাত্রার প্রাধান্য স্থাপনে সুবিধা এনে দিয়েছে। এভাবে কৃষি নিজেই নিজের অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে— উদ্ভিদ ও প্রাণির মানব নির্বাচনের পথ খুলে দিয়ে।

ঐখানেই কেন?

কিন্তু এই পরিবর্তনের কাজটি দুনিয়ার সব জায়গায় এক সঙ্গে হয়নি। এটি কেন যে কিছু বিশেষ বিশেষ জায়গায় আগে ঘটলো— সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।

প্রাণি ও উদ্ভিদকে পোষ মানিয়ে প্রথম কৃষি ব্যবস্থা কোথায় চালু হয়েছে এ প্রশ্ন যখন উঠে, তখন উত্তর যে পাওয়া যায় তা হলো দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় আজকের ইরাক, ও তুরস্কের খানিক জায়গা মিলে সৃষ্ট তথাকথিত 'ফার্টাইল ক্রিসেণ্টে' অর্থাৎ বাঁকা চন্দ্রাকৃতি কিছু এলাকার উর্বর ভূখণ্ডে - খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৮৫০০ অব্দের দিকে। আজকের কৃষি ও পশুপালনে সব চেয়ে প্রধান পোষ মানা উদ্ভিদ ও প্রাণিগুলোকে প্রথম পোষ মানাবার কাজ সেই সময় এই জায়গাটিতেই সম্পন্ন হয়েছিল বলে সব রকম প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ রয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে গম, বার্লি, মটরশুটি, ভেড়া, ছাগল, গরু, কুকুর আর শূকর।

আবহাওয়া এবং খাদ্য সংক্রান্ত যে সব চাপের কারণে মানুষকে কৃষির দিকে যেতে হয়েছে সেই চাপগুলো তখন সেখানে ছিল। কিন্তু তা আরো বহু জায়গায়ও ছিল। তা হলে শুধু ফার্টাইল ক্রিসেণ্টেই কেন ঐ সময় এই পোষ মানাবার কাজটি প্রথম ঘটলো— প্রশ্নটি থেকে যায়।

কারণটি কিছুটা খুঁজে পাওয়া যায় ঐ অঞ্চলের স্থানীয় বন্য উদ্ভিদ ও পশু পাখিদের একটি ধারণা থেকে। বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় আজকের ওখানকার পোষমানা জীবগুলোর বন্য পূর্বপুরুষদের প্রায় প্রত্যেকটিকেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এরা ঐ অঞ্চলেরই প্রকৃতিতে তখন ছিল। শিকারি-সংগ্রাহকরা ওগুলোর উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করছিল বটে, কিন্তু কিছু কিছু অসুবিধা এদের নিয়ে হচ্ছিল। যেমন গম বার্লির কথা ধরা যাক। এসব শস্যের বন্যরূপে দানাগুলো কুশির উপর এমনভাবে থাকে যেন পাকলে ঝরে গিয়ে মাটিতে পড়ে। এর ফলে শস্যের বংশ বিস্তারে সুবিধা হতো বটে, কিন্তু মানুষ সংগ্রাহকের জন্য সেটি ছিল খুবই অসুবিধাজনক। এর মধ্যে অবশ্য কিছু বদলে যাওয়া গম বা বার্লি থাকতো

(মিউট্যাণ্ট) যেগুলোর ঐ ঝরে যাওয়ার গুণটি থাকতোনা। এরকম বিজাতীয় গম বেশি হতে পারতোনা কারণ তাদের মাটিতে পড়ে বংশ বিস্তারের সুযোগ ছিলনা। কিন্তু সংগ্রাহকরা সহজে এদের সংগ্রহ করে নিতে পারতো। বেছে বেছে এগুলো এনে নিজেরাই এদের বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা মানুষ তখন করে ফেললো খানিকটা বাধ্য হয়েই। মানুষের যত্নের ফলে ক্রমে এই না-ঝরা গমই প্রধান হয়ে পড়লো। এ ভাবে ফার্টাইল ক্রিসেণ্টের মানুষ বাধ্য হয়েই বা নিজের সুবিধার জন্যই বন্য মুরগিকে বাছাই করেছে বড় আকারে পাওয়ার জন্য, বন্য গরুকে বাছাই করেছে ছোটখাট নিরীহ দেখে, বন্য ভেড়াকে বাছাই করেছে মোলায়েম স্থায়ী লোম দেখে, ইত্যাদি। এরা এভাবে হয়ে পড়েছে কৃষির আওতায় সুবিধাজনক জীব—অনেক সংখ্যায়।

কোন-কোন ক্ষেত্রে একই প্রাণিকে বিভিন্ন কারণেও বাছাই করা হয়েছে। যেমন বন্য কুকুর থেকে পোষ মানা কুকুরের কথাই ধরা যাক। কুকুরকে বাছাই করা হয়েছে কোন ক্ষেত্রে নেকড়ের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সাহায্যের জন্য, কোনটিকে ইঁদুরের গর্ত থেকে ইঁদুর বের করে দেয়ার জন্য, কোনটিকে শিকারে সাহায্য করার জন্য— ইত্যাদি। এগুলো তাই হয়েছেও এক একটি এক এক রকম।

আজ দুনিয়ার সব জায়গার মানুষ কৃষিতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই কৃষি শুরুতে মাত্র কয়েকটি জায়গাতেই নিজস্ব ভাবে শুরু হতে পেরেছে— যেমন ফার্টাইল ক্রিসেণ্টে এবং পৃথিবীর বড় জোর আর আটটি জায়গাতে। বাকি জায়গায় মানুষ শিকারি-সংগ্রাহক হয়েই ছিল আরো বহুকাল। এর কারণ বুঝতে হলে প্রথমে আর একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। পোষ মানা অর্থাৎ কৃষিযোগ্য উদ্ভিদ ও প্রাণির সংখ্যা মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাত্র কেন?

সব জীব কেন পোষ মানে না?

কৃষির দীর্ঘ ইতিহাসের কথা চিন্তা করে অবাক হতে হয় যে সেই শুরুতে যে কটি প্রাণী ও উদ্ভিদকে মানুষ পোষ মানিয়ে কৃষিতে আসতে পেরেছিলো আজও বলতে গেলে ঐ ক'টাই কৃষির প্রধান উপজীব্য হয়ে রয়েছে। অন্যগুলোকেও এর মধ্যে আনার চেষ্টা যে করা হয়নি তা নয়–কিন্তু সে চেষ্টা খুব অল্প ক্ষেত্রেই সফল হয়েছে। যেমন অপেক্ষাকৃত বড় আকারের তৃণভোজী বা সর্বভোজী পশুর কথা চিন্তা করা যাক—যেগুলোকে পোষ মানিয়ে মানুষ লাভবান হতে পারে। ৪৫ কিলো বা তার উপরে ওজন হতে পারে এ রকম তৃণভোজী বা সর্বভোজী পশুর সংখ্যা দুনিয়াতে ১৪৮টি। অথচ এর মধ্যে মাত্র ১৪টিকে সত্যিকার অর্থে কৃষিতে পোষ মানানো সম্ভব হয়েছে। বাকি ১৩৪ টিকে কেন পোষ মানানো গেল না সেটি একটি

বড় প্রশ্নই বটে। তেমনি কৃষিকাজে আসতে পারতো এরকম উচ্চতর উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে দুনিয়াতে প্রায় দুই লক্ষ। অথচ এর মধ্যে মাত্র প্রায় ১০০টিকে কৃষির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এরও বা কারণ কি?

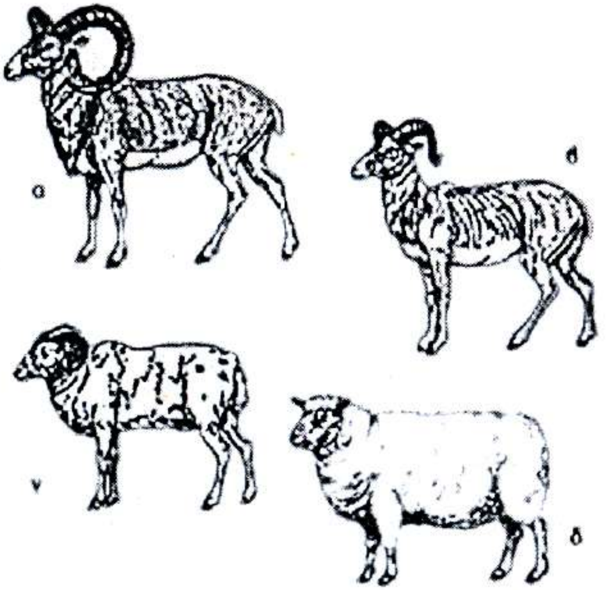

ভাবনার কথা হলো এমন সব প্রাণি পোষ মানানোর আওতার বাইরে রয়ে গেছে- যার খুব নিকটাত্মীয় কাছের প্রজাতিই বহুকাল ধরেই পোষ মেনে রয়েছে। ঘোড়া আর গাধা মানুষের চমৎকার পোষমানা পশু, অথচ তারই আত্মীয় জেব্রার ক্ষেত্রে এটি কখনোই সম্ভব হয়নি।

সমস্যাটি কি আমাদের চেষ্টার ত্রুটিতে না পোষ না মানা পশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত? যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন যে আফ্রিকা মহাদেশের কোন প্রাণিকে কখনো পোষ মানানো হয়নি, তার কারণ ওখানে মানুষ পোষ মানাবার প্রয়োজনটিই অনুভব করেনি— চারিদিকে শিকার বা সংগ্রহের উপযুক্ত এত প্রাণি রয়েছে যে প্রকৃতি থেকেই সব চাহিদা মেটে। কিন্তু এই ধারণা যদি সত্যি হতো তাহলে এশিয়া বা ইউরোপে পোষ মানানো প্রাণিকে যখন আফ্রিকার নেয়া হয়েছে সেগুলো যেখানে পোষ্য হিসাবে এত কদর পেত না। আর পরবর্তীতে ইউরোপ থেকে কৃষিতে ও পশুপালনে দক্ষ বহিরাগতরা যখন আফ্রিকায় বসত করেছে, তারা আফ্রিকান প্রাণিদেরকে পোষ মানাতে ইচ্ছুক হতো। এর কোনটিই কিন্তু হয়নি।

বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়ে দিচ্ছে যে একটি প্রাণিকে পোষ মানানো যাবে কি যাবে না তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ প্রাণিটির বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এশিয়া আর ইউরোপের পোষ মানানো প্রাণিকে যখনই অন্য মহাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানকার মানুষ এই বিদ্যা সাদরে গ্রহণ করেছে। তাছাড়া এই প্রাণিগুলোকেই পৃথিবীর নানা অংশে নানা মানবগোষ্ঠি নিজ থেকেই নূতনভাবে পোষ মানিয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে পোষ মানাতে দক্ষ মানুষরা নূতন জায়গায় গিয়ে অনেক নূতন প্রাণিকে পোষ মানাতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ মানুষ বন্য প্রকৃতিতে বহু রকমের পশুপাখির মধ্যে অনেক গুণ, অনেক উপকারিতা খুঁজে পেয়েছে বরাবর, ওগুলো ব্যবহার করেছে, কিন্তু তাদের পোষ মানাতে পারেনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেন পারেনি সেই কারণও মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে। এই সবই দেখিয়ে দিচ্ছে যে সমস্যাটি ঐ প্রাণির মধ্যেই। এ সব বুঝার ক্ষেত্রে বেশ সুবিধা হয় যদি আমরা পোষ মানা জীবের সঙ্গে তাদের কোন নিকট জ্ঞাতি পোষ না মানা জীবের তুলনা করি। যেমন ওক গাছের প্রাচুর্য ও প্রাধান্য ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার অনেক জায়গায় — আর এর বাদামও সবার খুব প্রিয়। কিন্তু অন্য বাদামের চাষ হয় খাদ্যের জন্য, ওকের হয় না। এর কারণ সাধারণ নানা বাদাম ও ওক উভয়েরই বিভিন্ন জাতের বিষাক্ততা রয়েছে। সাধারণ বাদামের বিষহীন যে সদস্য তাদের বংশধররাও বিষহীন হতে পারে তার জিন বৈশিষ্ট্যের কারণে। কিন্তু ওকের ক্ষেত্রে তা হয় না। তাই কুড়িয়ে খাওয়ার জন্য বেছে বেছে অবিষাক্ত ওকের বাদাম খাওয়া গেলেও — ওগুলোকে পোষ মানিয়ে চাষ করা যায়নি।

আর একটি উদাহরণ দেয়া যায় জেব্রার ক্ষেত্রে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছে—তাদের সঙ্গে ঘোড়া পালনকারীরাও ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তারা স্থানীয় জেব্রাকে ঘোড়ার বিকল্প হিসাবে পোষ মানাবার চেষ্টা করেছে। এ কাজ হাজার বছর আগে তাদের পূর্বসূরি আফ্রিকান পশুচারকরা করে ব্যর্থ হয়েছিল। দু' তিনশ' বছর ক্রমাগত চেষ্টা করে ইউরোপীয়রা

জেব্রাকে বশে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। দোষটা কিন্তু তাদের ছিল না— ছিল ঐ জেব্রার অন্তর্নিহিত স্বভাবের মধ্যে। জেব্রার এমন কিছু প্রতিকূল স্বভাব রয়েছে যা তার নিকট আত্মীয় ঘোড়ার মধ্যে নেই। প্রথমত: জেব্রা অত্যন্ত আক্রোশ সম্পন্ন প্রাণি— যারা তার কাছে আসতে চায় তাদেরকে আক্রমণ করাই এর স্বভাব। চিড়িয়াখানায় প্রায়ই দেখা যায় খাবার বা যত্ন নিতে আসা কর্মীদের এটি লাথি মারে, হাত কামড়ে ধরে। আর কামড়ে একবার ধরলে মারাত্মকভাবে আহত বা নিহত না করে ছাড়ার অভ্যাস জেব্রার নেই। সারা দুনিয়ার চিড়িয়াখানার তথ্যে দেখা যায়— জেব্রার হাতে যত কর্মী গুরুতর আহত হয়েছে, বাঘের হাতে তা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ জেব্রার প্রান্তিক দৃষ্টিশক্তি ঘোড়ার চেয়ে বেশি প্রখর। কাজেই পশুপালক তার গলায় দড়ি লাগাতে এলে বা ল্যাশো ছুড়ে দিলে জেব্রা ঠিকই টের পায় ও চকিতে সরে যেতে পারে।

নিকট আত্মীয়রা পোষ মানা সত্ত্বেও পোষ মানানো যায়নি এ রকম অন্য প্রাণিদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কিছু কিছু প্রতিকূল গুণ দেখা যায়। এমন সব প্রাণির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে এরকম ছয়টি বড় প্রতিকূলতা চিহ্নিত করা হয়েছে। মানুষ নিয়মিত যোগান দিতে পারবেনা এমন খাদ্যাভ্যাস (যেমন পিঁপড়াভুক, উইপোকা ভুক প্রাণি); অনেক

বছর পর পর বাচ্চা দেয়া প্রাণি, ও যাদের বাচ্চা খুব ধীরে বড় হয় (উদাহরণ হাতি, গরিলা); বন্দি অবস্থায় প্রজনন করতে না চাওয়া (উদাহরণ পান্ডা, চিতা); আক্রমণাত্মক অভ্যাস (উদাহরণঃ গ্রিজলি ভালুক, গণ্ডার); দলপতির নেতৃত্ব মেনে তাকে অনুসরণ করাতে আপত্তি (উদাহরণ বিগহর্ণ ভেড়া, এন্টিলোপ হরিণ), স্বল্প জায়গায় আবদ্ধ থাকলে অথবা কোন আক্রমণকারী কাছে এলে দিগ্‌বিদিক ভুলে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়া (উদাহরণঃ গাজেল ও বিভিন্ন হরিণ, অবশ্য বল্গা হরিণ এর ব্যতিক্রম)। এর প্রত্যেকটি প্রতিকূলতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে এমন প্রাণি দেখা গেছে যে ছয়টির মধ্যে পাঁচটিতেই পাশ করেছে অর্থাৎ ঐ প্রতিকূলতাগুলো নেই, কিন্তু মাত্র একটার জন্য তাকে পোষ মানানো সম্ভব হয়নি। তাই ঘোড়া পোষ মেনেছে কিন্তু তার আত্মীয় জেব্রা মানেনি। বল্গা হরিণ মেনেছে, কিন্তু অন্য হরিণ মানেনি। ভেড়া মেনেছে, কিন্তু উত্তর আমেরিকার ভেড়া মানেনি। আমাদের মোষ মেনেছে, কিন্তু আফ্রিকান মোষ মানেনি। সাধারণ ছাগল মেনেছে, কিন্তু রকি মাউন্টেন ছাগল মানেনি। বাদাম মেনেছে, কিন্তু ওক মানেনি।

কৃষি এত কম জায়গায় শুরু হলো কেন?

শিকারী-সংগ্রাহকের তুলনায় কৃষকের জীবনের সুবিধা অনেক। তবুও কিন্তু কৃষি শুরু হয়েছে অল্প কয়েকটা জায়গায় মাত্র। তারাই তাদের প্রভাব বিস্তার করে, যুদ্ধ জয় ইত্যাদির সাহায্যে বাকি জায়গায়ও কৃষিকে ধীরে ধীরে নিয়ে গেছে গত তের হাজার বছর ধরে। সারা দুনিয়ায় ঐ কৃষি শুরুর জায়গা বড় জোর মাত্র নয়টি– দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ফার্টাইল ক্রিসেন্ট, চীনের কিছু অঞ্চল, মধ্য আমেরিকা, আণ্ডিজ ও আমাজন এলাকা, বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব অঞ্চল, আফ্রিকার সাহেল, উষ্ণ মণ্ডলীয় পশ্চিম আফ্রিকা, ইথিওপিয়া এবং নিউগিনি। অদ্ভুত ব্যাপার হলো

আজকের কৃষি সমৃদ্ধ উর্বর জায়গাগুলোর সঙ্গে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। আজকের শস্য ভাণ্ডার বলতে যেই উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ সমতল, ক্যালিফোর্নিয়া, ইউরোপ, আর্জেন্টিনার পাম্পা, দক্ষিণ আফ্রিকার কেইপ, ভারতীয় উপমহাদেশ, জাভা ইত্যাদির কথা আসে– ঐ তালিকায় কিন্তু তারা কেউ নাই।

দেখা যাচ্ছে উর্বরতা নয়, বরং বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণিদের মধ্যে বেশি সংখ্যককে যেখানে আদিতে পোষ মানানো সম্ভব হয়েছিল, সেগুলোর আবাসভূমি তখন যেখানে যেখানে বেশি ছিল– সেখানেই কৃষি শুরু হতে পেরেছিল। শুধু সেখানেই সম্ভব হয়েছিল শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন থেকে কৃষকের জীবনের সুবিধাটি প্রমাণিত করার। এরপর একবার যখন ঐ নয়টি জায়গায় কৃষি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে– ও অন্যান্য জায়গায় তা ছড়িয়েছে– তারপর থেকে কৃষিতে এসব জায়গার আর প্রাধান্য থাকেনি। বরং এ প্রাধান্য চলে গেছে উর্বরতর অঞ্চলগুলোতে। উদাহরণ স্বরূপ ফার্টাইল ক্রিসেন্ট অঞ্চলে বন্য গম, বার্লি, মটরশুটি, ভেড়া, ছাগল, গরু, শুকর– এসব এমন কিছু প্রজাতি মজুদ ছিল যাদের পোষ মানাবার পথে কোন বাধা ছিলনা। আর আজও সেগুলো আধুনিক কৃষিতে বড় ভূমিকা রাখছে। ফার্টাইল ক্রিসেন্টে যে আজ থেকে প্রায় সাড়ে দশ হাজার বছর আগে কৃষির প্রথম উন্মেষ হয়েছিল তা এ কারণেই। ওখান থেকেই মানুষ পরে পশ্চিমে ইউরোপে, পূর্বে ভারতে, দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকায় এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ায় বিস্তৃত হয়েছে। ওরা নিয়ে গেছে দুনিয়ার প্রথম ধাতুর হাতিয়ার, লেখন পদ্ধতি, সাম্রাজ্য বিস্তারের অভ্যাস আর সংগঠিত সেনাবাহিনী। সেই সঙ্গে বিস্তৃত হয়েছে কৃষি। সেই কৃষি এসব নূতন জায়গায় উর্বরতর স্থানগুলোতে গিয়ে অনেক বেশি সোণা ফলিয়েছে। তখন কৃষির মূল জন্মভূমি ফার্টাইল ক্রিসেন্টের প্রাথমিক সুবিধা নিস্প্রভ হয়ে এসেছে। পরিবেশগত নানা ভুল অভ্যাসের কারণে এই এলাকা পরিণত হয়েছে মরুময়, বৃষ্টিহীন, উর্বর মাটির অবক্ষয়ে রুক্ষ, লবণাক্ততায় আক্রান্ত– যার সবই কৃষির বিপক্ষে কাজ করছে।

কৃষিজাত খাদ্যের বিস্তার

কৃষির প্রথম উদ্ভব যেখানে হয়েছে তার বাইরে শিকারি সংগ্রাহকের খাদ্য রীতির থেকে কৃষকের খাদ্য রীতিতে মানুষ দুই ভিন্ন পথে এসেছে। একটি হলো ওখানকার শিকারি-সংগ্রাহকদের দ্বারা কৃষি অঞ্চল থেকে আসা পোষমানা উদ্ভিদ আর প্রাণির সন্ধান পাওয়া, আর সেগুলোকে অবলম্বন করে নিজেরাই কৃষক হয়ে পড়া। অবশ্য এ পদ্ধতিতে রূপান্তরটি খুব কমই হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো দক্ষিণ আফ্রিকার খইসান আদিবাসীরা এই ২০০০ বছর আগেও পুরাপুরি শিকারি-সংগ্রাহক

ছিল। এখনো তাদের মধ্যে ঐ জীবিকা রীতি দেখা যায়। ২০০০ বছর আগে তাদের কেউ কেউ অন্যত্র পোষমানা গো-মহিষ, ভেড়া ও ছাগলের সংস্পর্শে আসে উত্তরের কিছু গোত্রের মাধ্যমে। ঐ সব খইসান তখন থেকে পশুচারকে পরিণত হয়, এবং হটেনটট নামে আমরা তাদের চিনি।

এভাবে অন্যত্র পোষমানা প্রাণি নিয়ে নিজেরা পেশা বদলিয়েছে এমনটি কমই ঘটেছে। দ্বিতীয় যে পদ্ধতিতে কৃষি ছড়িয়েছে তা হলো—কৃষকরা তাদের শক্তিবৃদ্ধির কারণে সহজেই অন্যদের দেশে হানা দিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং সেদেশকে কৃষির দেশে পরিণত করেছে। শিকারি-সংগ্রাহকদের অপেক্ষা সংখ্যায়, প্রযুক্তিতে, রাজনৈতিকভাবে এবং সামরিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকাতে কৃষিজীবি গোষ্ঠিদের পক্ষে এটি সম্ভব হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিকারি-সংগ্রাহকরা অন্যত্র পোষমানা ফসল ও প্রাণির সন্ধান লাভের আগেই তারা কৃষকদের আক্রমণে উৎখাত হয়ে গেছে।

এর একটি কারণ হলো ফসল, গৃহপালিত ও চারণের পশু, এমনকি মানুষের নিজেদেরও বিস্তারন সব সময় সহজ হয়নি। যেমন এদের উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃতিটি পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তৃতির চেয়ে বেশ কঠিনই ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃতি একই অক্ষরেখা বরাবর হয় বলে পুরানো অবস্থানের সঙ্গে নূতন অবস্থানের বেশ কিছু মিল থেকে যায়। জলবায়ু, দিন-রাতের দৈর্ঘ, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদির সাদৃশ্যের কারণে প্রকৃতি, বসত, জীবন-রীতি, রোগবালাই ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মিল থাকা স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে নূতন জায়গায় গিয়ে পোষমানানো উদ্ভিদ ও প্রাণিগুলোকে কৃষিতে কাজে লাগাতে অসুবিধা কম হয়। উদাহরণস্বরূপ ফার্টাইল ক্রিসেণ্ট (পশ্চিম এশিয়া) থেকে গম, ঘোড়া, এবং সেই সঙ্গে চাকা, লিখন পদ্ধতি ইত্যাদির পশ্চিম ও পূর্ব অভিমুখী যাত্রা হতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। একইভাবে চীন থেকে মুরগি, লেবু জাতীয় ফল, পীচ ফল ইত্যাদি পশ্চিম অভিমুখে এশিয়া ও ইউরোপে ছড়াতে অসুবিধা হয়নি। অন্যদিকে ইউরোপ-এশিয়ার পোষমানা প্রাণি বা ফসলের উত্তর থেকে দক্ষিণ যাত্রায় আফ্রিকা পৌঁছানোটা মোটেই দ্রুত হয়নি। অথবা দক্ষিণ আমেরিকায় মেক্সিকোর ভুট্টা বা লিখন পদ্ধতি, বা চাকা; আন্ডিজের প্রাণি লামা ও ফসল.আলু উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত হতেও সময় লেগেছে বিস্তর। এর কারণ উত্তর দক্ষিণ চলাচলে জলবায়ু আর প্রকৃতির পট পরিবর্তনটি খুবই নাটকীয়ভাবে হতে পারে– যা নূতন কৃষিকে নিয়ে যাওয়া কঠিন করে তোলে। অবশ্য পথটি পূর্ব-পশ্চিম হওয়া বা উত্তর-দক্ষিণ হওয়াটাই একমাত্র কথা নয়। মাঝখানে অন্য প্রাকৃতিক বাধাও থাকতে পারে যে কোন দিকে চলাচলেই। তবে সাধারণভাবে পূর্ব-পশ্চিম অভিগমনকে সহজতরই বলতে হবে। ইউরোপ আর এশিয়ার

সভ্যতাগুলো যেভাবে পূর্ব-পশ্চিম চলাচল থেকে কৃষি ও কৃষির ফলে সৃষ্ট অন্যান্য উপকরণ ও সক্ষমতায় সমৃদ্ধ হতে পেরেছে তাই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমেরিকার আদিবাসীদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়েছে। আমেরিকার আদিবাসীরা নিজ-নিজ অঞ্চলে যথেষ্ট উন্নতি করলেও উত্তর-দক্ষিণ সমস্যার কারণে তাদের সব সমৃদ্ধি একযোগে একত্রিত হতে পারেনি, আর তাই উল্টোটা ঘটতে পারেনি– আমেরিকার আদিবাসীরা ইউরেশিয়াতে অভিযান চালিয়ে এখানে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি।

কৃষির ফলশ্রুতি

কৃষির ফলে মানুষ স্থায়ী বসত, বাগান, কৃষি ভূমি, চারণ ভূমি ইত্যাদি গড়ে তুলতে পেরেছে। তাকে আর মৌসুমী সুবিধা অনুসরণ করে বন্য প্রাণি বা ফলমূলের পেছনে ঘুরে ঘুরে কাটাতে হয়নি। অবশ্য শিকারি-সংগ্রাহকদের মধ্যে যারা অতিমাত্রায় ভাগ্যবান ছিল— যাদের হাতের কাছে শিকার আর সংগ্রহের জিনিস প্রচুর ছিল— তারাও মোটামুটি এক জায়গায় বসত করেই কাটাতে পারত। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কৃষি ও স্থায়ী বসতের ফলে খাদ্য উৎপাদনে যে প্রাচুর্য এলো তার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো জনসংখ্যা বিস্ফোরণ— যা প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে আজো অব্যাহত আছে। দুটি পৃথক কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। প্রথমত একস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করার ফলে ঘন ঘন সন্তান নেবার ক্ষেত্রে সুবিধা রয়েছে— যাযাবর জীবনে যা হতোনা। দ্বিতীয়ত কৃষি ব্যবস্থায় খাদ্য উৎপাদনের ঘনত্ব বন্য অবস্থায় এর প্রাপ্তির তুলনায় অনেক বেশি। অধিক খাদ্য ফলানো শুধু জনসংখ্যার বিস্ফোরণই ঘটায়নি, প্রযুক্তিরও বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। স্থায়ী বসবাসের ফলে ভারী যন্ত্রপাতি স্থাপনের সুবিধা হয়েছে—যা যাযাবর জীবনে বহন করে বেড়ানো যেতনা। তা ছাড়া শুধু প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য এবং সেগুলো বিশেষজ্ঞের কুশলতায় ব্যবহার করার জন্য ফুল-টাইম কারিগর, উদ্ভাবকদের পেশা এখন সম্ভব হলো। কৃষিজীবিরা এখন যার যার খাদ্য উৎপাদন করার পরও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকছে বলে রাজা, আমলা, অমাত্য, পরিষদ, সৈন্য সবার জন্যও খাদ্য যোগান সম্ভব হলো। ফলে এসব নূতন প্রতিষ্ঠান ও সেই সঙ্গে রাজ্যপাট, সাম্রাজ্য, বিজয় ইত্যাদি সম্ভব হয়ে উঠলো। কৃষিজীবি গোষ্ঠিগুলো যে শিকারি-সংগ্রাহকদের উপর চড়াও হয়ে তাদের উৎখাত করতে পারলো— এই সব সুবিধার কারণেই তা সম্ভব হলো।

কৃষি এনেছে সংক্রামক রোগ

কৃষি জীবন শুরু হবার পর থেকে অধিক সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মহামারী আকারের সংক্রামক রোগ। এসব রোগ দেখা দিলে দলে দলে

মানুষ হয় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, অথবা সুস্থ হয়ে ঐ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লাভ করে। এধরণের রোগ ঘন বসতি ছাড়া সম্ভব নয় — আর কৃষি তারই সুযোগ করে দিয়েছে। এ সব রোগের ছড়ানোর জন্যই শুধু কৃষি দায়ী নয়; অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত তথ্য মতে অনেক রোগের উৎপত্তির জন্যও কৃষির মাধ্যমে পোষা পশুপাখির নৈকট্যই দায়ী। আধুনিক মলেক্যুলার বায়োলজির গবেষণা দেখিয়েছে আদিতে পশুপাখির সংক্রামক রোগগুলোই জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের মহামারীতে পরিণত হয়েছে। ম্যাডকাউ ডিজিজ, বার্ড ফ্ল্যু, এইডস ইত্যাদি অনেকগুলো সাম্প্রতিক মহামারীর ক্ষেত্রেও এভাবে পশুপাখির থেকে মানুষে সঞ্চারণের বিষয়টি বেশ জোরালোভাবে এসেছে। আর অতীতে মহামারীগুলোরও আদি উৎস খুব সম্ভব আদি কৃষকের পশু-পাখির সান্নিধ্য থেকেই সৃষ্ট।

পশুপাখি পোষ মানাবার বিষয়টি প্রধানত ঘটেছিল ইউরোপ-এশিয়ায়– তাই মহামারী প্রকটও হয়েছে এখানেই। আর এখানকার টিকে যাওয়া লোকেরা এসব থেকে প্রতিরোধও পেয়েছে বেশি। কিন্তু এখান থেকে বিজয়ী বেশে বা বসত স্থাপনকারী হিসাবে মানুষ যখন আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, প্যাসেফিক দ্বীপ ইত্যাদি অঞ্চলে গিয়েছে সেখানে প্রথমবারের মত এই রোগও বহন করে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার আদিবাসী মানুষের বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ ক্ষমতা এর বিরুদ্ধে ছিলনা বলে ওরা সহজেই কাবু হয়েছে। এভাবে ইউরোপ এশিয়ার বসতকারীরা স্থানীয় মানুষদেরকে চিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল — যতটা না নিজেদের অস্ত্র দিয়ে, তার চেয়ে বেশি নিজেদের রোগ দিয়ে।

আরো উদ্ভিদ ও আরো প্রাণি কি পোষ মানবে?

বিশাল উদ্ভিদ আর প্রাণি জগতের একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে পোষ মানাবার উপরেই এখনো আমরা পুরো মানব জাতি নির্ভরশীল। ভবিষ্যতেও কি এই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশটি ক্ষুদ্রই থাকবে? আধুনিক বিজ্ঞান উদ্ভিদ ও প্রাণির উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের সুযোগ এনে দিচ্ছে বলে আরো নানা প্রজাতির প্রজনন ইত্যাদির উপর আমরা জোর খাটাতে পারছি। কিন্তু তাই বলে আমরা অধিক সংখ্যক উদ্ভিদ বা প্রাণিকে পোষ মানিয়ে কৃষিতে এনেছি একথা বলা যাচ্ছেনা। বড় ও মূল্যবান যে ১৪টি প্রাণিকে কৃষির পুরো ইতিহাসে মানুষ পোষ মানিয়েছে তার মধ্যে একমাত্র বল্গা হরিণটিই যোগ হয়েছে গত এক হাজার বছরের মধ্যে, বাকিসব হয়েছে আরো অনেক আগে। আর এই বল্গা হরিণ অর্থনৈতিকভাবে কমই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সব নূতন প্রাণি যেগুলোর উপর পোষ মানাবার চেষ্টা গত দু'এক হাজার বা তারো বেশি সময় ধরে করা হয়েছে— তার প্রায় সবই ব্যর্থ হয়েছে।

শুধু হরিণ বা আমেরিকান বাইসনের মত দু'একটির ক্ষেত্রে ঘেরা বেড়া দিয়ে খামারের মত জায়গায় পালন করা যায়— এইটুকুমাত্র সম্ভব হয়েছে— ঠিক পোষ মানানো নয়। তাছাড়া এই শেষোক্তগুলো আর্থিকভাবে তেমন বেশি কাজেও আসেনি।

অবশ্য অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে নূতন প্রাণির সফল পোষ মানানো যে একেবারেই হয়নি, তা নয়। ছোট ছোট প্রাণি যেগুলো অনেক সময় ল্যাবোরেটরির গবেষণার জন্য প্রয়োজন হয়েছে এমন কয়েকটাকে ঠিকই পোষ মানানো গিয়েছে। এর মধ্যে আছে ইদুঁর, খরগোস, হ্যামষ্টার, চিনচিলা, মেরু-শেয়াল ইত্যাদি। তবে ব্যাপক উপযোগিতায় এরা ঐ প্রাচীন গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, শূকরের কাছে ধারে কাছেও নেই। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। কয়েকটি বন্য উদ্ভিদ যদিও অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কৃষিতে আনার তালিকায় যোগ হয়েছে (যেমন ব্লুবেরি, ষ্ট্রবেরি, ম্যাকাডামিয়া বাদাম, প্যাকান ইত্যাদি), তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা এক্ষেত্রেও ঘটেনি— যা গম, ধান, ভুট্টা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয়। সর্বাধুনিক জীব বিজ্ঞান, বিশেষ করে জেনেটিক কারিগরি এই অসফল অবস্থার ক্ষেত্রে কোন বড় পরিবর্তন আনতে পারে কিনা এখন সেটিই লক্ষ্যণীয়। যে জিনগত কারণে কোন কোন উদ্ভিদ বা প্রাণিকে কিছুতেই পোষ মানানো যায়নি— তাদের সমগোত্রীয়রা পোষ মানা সত্ত্বেও—সেখানে পরিবর্তন করে তার নূতন ধারার পোষ মানানযোগ্য জাত সৃষ্টি করা কি সম্ভব হবে? এই ব্যাপারে অনেক বিজ্ঞানী একটি বড় ধরনের পরিবর্তনে আশাবাদী। হয়তো বহু হাজার বছর আগে পোষ মানাবার ক্ষেত্রে যে বড় চমক শেষ হয়ে গিয়েছিল, তা শিগ্গির আবার ফিরে আসবে।

মানুষ কখন শস্য ভেঙ্গে রুটি বানালো

মানুষের ইতিহাসে একটি দীর্ঘ সময় গেছে যখন শিকার করে, আর কুড়িয়ে খেয়েই তাকে বাঁচতে হয়েছে। ঐ সময়েও মানুষের প্রযুক্তি কিন্তু থেমে ছিলনা। এর মধ্যে তারা আবিষ্কার করেছিলো যে ঘাস জাতীয় কিছু উদ্ভিদের শস্য কুড়িয়ে খাওয়ার কাজটি বেশ চলে—যেগুলোর মধ্যে আমাদের আজকের বার্লি, গম ইত্যাদি কয়েকটি জনপ্রিয় শস্যের বন্য পূর্বসুরিও ছিল। কিন্তু এসব শস্য দানা ছোবড়া,

আঁশসহ যে শক্ত অবস্থায় পাওয়া যেত তা খাওয়া সহজ ছিলনা, পুষ্টিও কম পাওয়া যেত। তাই এক পর্যায়ে মানুষ একে ভেঙ্গে খাবার অধিক উপযোগী আটা করতে শিখলো। এর ফলে ছোবড়া, তুষ ইত্যাদি শক্ত হজম-আযোগ্য অংশ বাদ দিয়ে একে সহজপাচ্য খাদ্য হিসাবে পাওয়া গেল। পানি মিশিয়ে মন্ড বানিয়ে তাকে উত্তপ্ত পাথরে রেখে এক রকম 'রুটি' তৈরির কাজও আর পিছিয়ে থাকেনি। সেই থেকে আজ অবধি সেই আটার রুটির স্বাদ ও পুষ্টি আমরা পাচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো ঠিক কখন মানুষ এভাবে শস্য ভেঙ্গে আটা ও রুটি তৈরি করতে শিখলো? গত বছর গবেষণা সাময়িকী 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পানামা, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁদের যৌথ গবেষণার ফলশ্রুতিতে সেই অনন্য সময়টি বের করতে পেরেছেন বলে দাবী করেছেন।

গ্যালিলী সাগরের প্রাচীন বসত

সুযোগটি এনে দিয়েছে নব্বইয়ের দশকে ইসরায়েলে গ্যালিলী সাগরের তীরে আবিষ্কৃত কিছু পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কারের ফলে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২১২ মিটার নিচু ঐ জায়গাটি সাধারণত দুই তিন মিটার পানির তলায় থাকে। কিন্তু ঐ সময় পানি নাটকীয়ভাবে নেমে যাওয়ায় জায়গাটি উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। এরপর এখানে কয়েক বছর ধরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রায় ২৩ হাজার বছর আগের একটি মানব-বসতির নানা চিহ্ন আবিস্কৃত হয়েছে। হ্রদসদৃশ সাগর তলের পাললিক সঞ্চয়ের মধ্যে বহু উদ্ভিজ ও প্রাণিজ নমুনা এখানে চমৎকারভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মানুষের আবাস কুড়ে ঘরের চিহ্ন, মানুষের কবর, ব্যবহৃত লতাপাতা ছাড়াও নানা রকম প্রাণির ও দেহাবশেষ ওখানে পাওয়া গেছে। অন্তত ৩০ রকমের উদ্ভিদের নমুনা রয়েছে যেগুলো মানুষ খাদ্য অথবা অন্য কোন না কোন ভাবে নিজের কাজে ব্যবহার করেছে। তার মধ্যে বন্য জাতের এক ধরনের বার্লি ও গমের নমুনা সহ বেশ কিছু ঘাস জাতীয় শস্যের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সব আবিষ্কারের মধ্যে এটিই এসব শস্য ব্যবহারের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হচ্ছে। যেভাবে এগুলোকে পাওয়া গেছে তাতে মোটামুটি ব্যাপকভাবে এগুলো খাদ্য হিসাবে যে ব্যবহৃত হতো তাতে কোন সন্দেহ নাই। এর এক অংশে আবার বসত বাড়ির সঙ্গেই পাওয়া গেছে চেপ্টা বড় একটি ব্যাসাল্ট পাথর যা অনেকগুলো নুড়ি পাথর দিয়ে আটকিয়ে বালির উপর বেশ শক্ত করে বিছানো। দেখে মনে হয় এ পাথরকে উপর থেকে অন্য কিছু দিয়ে আঘাত করার কাজে ব্যবহার করা হতো। এর আশ পাশেই ছাড়িয়ে আছে অনেক বন্য ঘাসের শস্য– যেগুলো খাদ্য ও ভেষজ শস্য বলে এখনো পরিচিত। সব রকম চিহ্ন বলছে যে ঐ পাথরের উপর রেখে এ সব শস্য ভাঙ্গা হতো। কিন্তু এর সরাসরি বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত ছিলনা।

ঐ অঞ্চলেই এসেছিল প্রথম কৃষি

প্রকাশিত গবেষণাটিতে বিজ্ঞানীরা এই প্রমাণটিই পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাঁদের কাছে দুটি করণীয় ছিল। ঐ পাথরের গায়ে ও তার উপরিতলের ফাঁক ফোকরে ভাঙ্গা শস্যের নমুনা আবিষ্কার করা প্রয়োজন। আর ঐ শস্যের কোন গুঁড়া বা টুকরা নমুনা যদি সেখানে পাওয়া যায়, তা হলে সেগুলো যে ঠিক কোন শস্যের তাও গবেষণায় উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। এই কাজটিই তাঁরা করেছেন।

গ্যালিলী সাগরসহ সাধারণভাবে ঐ অঞ্চলটির একটি বড় গুরুত্ব রয়েছে এই প্রসঙ্গে। দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া– অর্থাৎ ইরাক, প্যালেষ্টাইন, লেবানন, জর্দান মিলে এই জায়গাটিতেই আমাদের প্রচলিত বেশ কয়েকটি শস্যের বন্য রূপের ব্যাপক প্রাপ্তি ও ব্যবহারটি প্রথম শুরু হয়েছিল। আর এখানেই আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে এসব কোন কোন শস্যকে পোষ মানিয়ে নিজে চাষ করে মানুষ কৃষি ব্যবস্থা শুরু করেছিল। তারও আগে বন্য শস্য থেকে আটা তৈরির পদ্ধতিটিও এখানেই মানুষের প্রথম আয়ত্ত করাটি বেশ স্বাভাবিক। কাজেই বিজ্ঞানীরা ঐ পাথর আর তাতে আটকে থাকা শস্যের গুঁড়ার নমুনার বিশ্লেষণে যে এত মনোযোগী হয়েছেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

নানা উদ্ভিজের ভাঙ্গাই-পেষাই

শস্য ভাঙ্গার কাজে প্রমাণিত ভাবে না হলেও অন্যান্য উদ্ভিজ খাদ্যের ক্ষেত্রে মানুষ যে সুদূর অতীত থেকে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করে এসেছে তার নানা নিদর্শন নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। মূল, কন্দ, বীজ, বাদাম ইত্যাদি নানা কিছু পাটার মত খোলা পাথরের উপর অন্য পাথর দিয়ে ভেঙ্গে পিষে বা পাথরের গর্তকে হামানদিস্তার মত ব্যবহার করে পেষার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এরকম সর্ব প্রাচীন যা আবিষ্কার হয়েছে তা প্রায় ৪৫,০০০ বছর পুরানো। এই সময়কাল ও নানা সাক্ষ্য থেকে বুঝা গেছে যে এই ধরনের উদ্ভিজ ভাঙ্গাই বা পেষাইয়ের কাজ যে মানুষ প্রথম করেছে তারা আমাদের মতই হবহু একই প্রজাতির মানুষ– অর্থাৎ হোমোসেপিয়েন্স। আমাদের মত আধুনিক মানুষের আগে জীবতাত্ত্বিকভাবে কিছুটা ভিন্ন ধরনের যে মানুষ ছিল তাদের রেখে যাওয়া হাতিয়ারের মধ্যে এরকম উদ্ভিজ ভাঙ্গা-পেষার কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। গ্যালিলী সাগরের মানব বসতের নমুনা নিয়ে শস্য ভাঙ্গার উপর যে গবেষণা হয়েছে সেটি অবশ্য আরো পরের দিকের কথা– আজ থেকে ২৩ হাজার বছর আগের বা তারও পরের কথা। পূর্ববর্তী সময়ের নিদর্শনগুলোতে ঐ ভাঙ্গাই-পেষাইয়ের ক্ষেত্রে শস্য ভেঙ্গে আটা করার কোন প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয়নি। এর একটি কারণ হলো এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হাতিয়ারের

সঙ্গে ঐ গোটা শস্যের বা তার গাছের কোন নমুনা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া হাতিয়ারের পাথরের গায়েও শস্যের চিহ্ন দেখা বা সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তা করাতে একটি বড় সমস্যা হলো প্রায় সব ক্ষেত্রেই একই হাতিয়ারের সাহায্যে রঙের গুড়া করার জন্য নানা রকম পাথর, মাটি, খনিজ গুড়া করার এমনকি পশুর হাড় ভাঙ্গার নমুনাও লেগে থাকতে দেখা গেছে– যার ভেতর সূক্ষ্ম শস্য কণার অস্থিত্ব খুঁজে পাওয়া দুরূহ ছিল।

পাথরের গা থেকে শস্য কণার উদ্ধার ও সনাক্তকরণ

গ্যালিলী সাগর তীরের মানব বসতে যে পাথরের হাতিয়ারকে শস্য ভাঙ্গার কাজে ব্যবহৃত বলে মনে করা হয়েছে, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের প্রথম বড় কাজ ছিল এর গা থেকে শস্য কণা উদ্ধার করার চেষ্টা। তা সনাক্ত করা গেলে নিশ্চিত বলা যাবে এই পাথর শস্য ভাঙ্গতে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা। এ জন্য পাথরের উপরিতলকে ষ্টেরিওস্কোপিক মাইক্রোস্কোপের তলায় একশ'গুণ বিবর্ধনে পরীক্ষা করে এর বিভিন্ন ক্ষুদ্র গর্ত ও ফাঁক ফোকরে সূঁচ ঢুকিয়ে তাতে থাকা কোন কণাকে বের করে আনা হয়েছে। এগুলোকে ৪০০ গুণ বিবর্ধনে পোলারিত এবং অপোলারিত আলোর মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করা হয়েছে। তাছাড়া পুরো পাথরটিকে তরলের মধ্যে ডুবিয়ে এবং তাতে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির আলট্রাসোনিক ঝাকুনি দিয়ে এর গা থাকে সূক্ষ্ম ধূলিকণার সঙ্গে আটার গুড়া থাকলে তাও আলগা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর শর্করা কণা সনাক্ত করার যেসব আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা রয়েছে সেগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে একই বসতে যে সব শস্যের ফসিল দেখা গেছে, বিশেষ করে সেগুলোর কণা চিনতে পারার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মোট ১৫০টি কণা এভাবে উদ্ধার হয়েছে– যার মধ্যে ১২৭টি কণা ঘাস জাতীয় শস্যের বলে সনাক্ত করা গেছে। আজকের আধুনিক শস্যগুলোর মধ্যে কণাকে মাইক্রোস্কোপে দেখলে তাতে যে গর্ত, অথবা স্তরীকরণ, অথবা বের হয়ে থাকা অংশ ইত্যাদি দেখা যায় সেই আলামতগুলো থেকেই তাদের প্রাচীন বন্য জ্ঞাতিগুলোকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষভাবে যে দুরকম শস্যের কণা খুঁজে পাওয়া গেছে সেগুলো হলো– বার্লি ও গমের কিছু বন্য জাত।

মজার ব্যাপার হলো ঐ পাথরের আশে-পাশে আরো বহু রকম ঘাস জাতীয় শস্য দানার প্রচুর নমুনা পোড়া অবস্থায় পাওয়া গেছে– যেগুলোর কণা পাথরের গায়ে ছিলনা। ঐ পোড়া শস্য গুলোর দানা তুলনামূলক ভাবে বেশ ছোট এবং তাই এগুলোকে পুড়ে সরাসরিই হয়তো খাওয়া যেত বলে, আটা করার প্রয়োজন হয়নি।

অন্যদিকে বার্লি ও গমের দানাগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত বড়। তাছাড়া ঐ পাথরের গা থেকে মূল, কন্দ ইত্যাদি জাতীয় কোন শর্করার কন্দও পাওয়া যায়নি– যা প্রাচীন হাতিয়ারে অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

সেঁকা রুটির স্বাদ

গ্যালিলী সাগর তীরের ঐ প্রাচীন বসতে, শস্য ভাঙ্গার পাথরটির কাছাকাছি আরো কিছু জিনিস পাওয়া গেছে যাতে ঐ আটার ব্যবহার সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। ওখানে আরো কয়েকটি পোড়ার চিহ্ন ও ছাই-সহ পাথর এমন ভাবে রাখা আছে যাতে স্পষ্ট মনে হয় যে রুটি সেঁকার এক ধরনের ওভেন হিসাবে তা ব্যবহৃত হতো। খুব সম্ভব পাথরের উপর ঐ সাদামাটা রুটি রেখে তাকে আবার জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো– যার ছাই এখানো রয়েছে। এই রুটি স্যাকার বিষয়টি মানুষের খাদ্যাভ্যাসে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। গম, বার্লির মত শস্যগুলো কাঁচা খেলে অথবা গোটা পুড়ে খেলেও শর্করা থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় গুড়ো করে আটা বানিয়ে, রুটি সেঁকে খেলে তার চেয়ে ৫৬% থেকে ৭২% বেশি শক্তি পাওয়া যায়। আমাদের পূর্বপুরুষরা বহু হাজার বছর আগেই অভিজ্ঞতা থেকে রুটি সেঁকার সুবিধাটি বুঝতে পেরেছিল।

ডেইট লাইনঃ আজ থেকে বিশ হাজার বছর আগে

বিজ্ঞানীদের সামনে মূল প্রশ্নটি ছিল এভাবে বন্য শস্যকে ভেঙ্গে যুৎসই সহজপাচ্য খাদ্য তৈরির এই যুগান্তকারী প্রক্রিয়াটি মানুষ শুরু করেছিল কতদিন আগে। গ্যালিলী সাগরের বসতিতে প্রাচীনতম যেই ক্ষেত্রে এটি সুপ্রমাণিত ভাবে দেখা গেল কার্বন ডেটিং থেকে বুঝা গেছে তা আজ থেকে প্রায় বিশ হাজার বছর আগের ঘটনা। যেহেতু শস্য ভাঙ্গার আর পাশাপাশি রুটি সেঁকার এই আয়োজন আর কোথাও, আর কোন পরীক্ষায় এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি, তাই আপাততঃ একেই এ প্রক্রিয়ার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে মেনে নিতে হবে। তখনো মানুষ বন্য শস্য কুড়িয়ে এনেই এসব প্রক্রিয়া চালিয়েছে। চাষ করে যুৎসই শস্য প্রতি বছর নিজের আওতায় জন্মানোর বিদ্যাটি আয়ত্ব করতে এরপরও মানুষের আরো দশ হাজার বছর লেগেছে। এবং তাও প্রথম সংঘটিত হয়েছে মোটামুটি ঐ অঞ্চলেই। মানুষ কি করে উন্নত মানুষ হয়ে উঠলো নিজের প্রযুক্তির বলে, সে ইতিহাস দেখতে গেলে এই ঘটনাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈ কি। সাম্প্রতিক এই গবেষণাটি তার মধ্যে আমাদের একটি বড় রকম কৌতুহল নিবৃত্তি করতে পারলো।

জিএম খাদ্য সম্পর্কে ভিন্ন মত

জিএম খাদ্য, অর্থাৎ জেনেটিকালি মডিফাইড (জিন-কারিগরির মাধ্যমে পরিবর্তিত) খাদ্য এখন অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। এ বিষয়ের বহু বিজ্ঞানী এবং বহু কৃষি ও খাদ্য সংক্রান্ত কোম্পানি মনে করেন আগামী দিনের বৃহত্তর জনসংখ্যার জন্য খাদ্য যোগান দিতে এটি জাদুর মতো কাজ করবে, এ ছাড়া গত্যন্তরও নাই। কিন্তু তার চেয়েও বেশি সংখ্যক বিজ্ঞানী এবং বহু দেশের চিন্তাশীল মানুষ ও সরকারগুলো মনে করে এ ধরনের খাদ্য মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এ কারণে অনেক দেশেই জিএম খাদ্য তৈরি বা আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আবার আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষসমূহ আইন করেছে যে, জিএম খাদ্য রপ্তানি করতে হলে, বিক্রয় করতে হলে মোড়কের উপর স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে যে এটি জিএম খাদ্য– যাতে আমদানিকারক বা ক্রেতা বুঝতে পারেন তিনি কী গ্রহণ করছেন।

যদিও অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, এরকম বিশ্বজনীন আতঙ্ক ও অনীহার ফলে জিএম খাদ্যের উন্নয়ন আতুড় ঘরেই মারা পড়ছে, সবাই কিন্তু তা ভাবেন না। বিখ্যাত অণু-জীববিদ রিচার্ড জেফারসনের মতে জিএম-বিপ্লব সবে শুরু হয়েছে মাত্র, এটি অনেক দূর যাবে। ভুল বোঝাবুঝিগুলো সৃষ্টি হয়েছে এ বিপ্লবের পরিচালনায় ভুল পদক্ষেপসমূহের জন্য। যেমন তিনি মনে করেন– উদ্ভিদের মধ্যে বিজাতীয় জিন প্রবেশ করিয়েই যে শুধু জিএম খাদ্য পাওয়া যাবে তা নয়। বরং এটি না করেও অত্যন্ত উঁচু মানের জিএম-প্রযুক্তি সম্ভব। এই যে ধানের বা ভুট্টার সবগুলো জিনের পরম্পরায় উদ্‌ঘাটন করার জন্য বিশাল আয়োজন– এর অনেকখানিই আসলে সময়-সম্পদের অপচয়। কারণ এটা জেনে জিনের কাজকে নিয়ন্ত্রণের খুব একটা সুবিধা হয় না।

টার্মিনেটর নয় এপোমিক্সিস

জিএম খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত একটি প্রক্রিয়া হল সমালোচকদের কাছে টার্মিনেটর নামে পরিচিত শস্যবীজ। এতে বৃহৎ বীজ-কোমপানিগুলো জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে খুবই উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন করেছে এবং তা কৃষকদের কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করছে। কিন্তু এই বীজগুলো ফসল উৎপাদন করলে সেই ফসল হবে বন্ধ্যা– কাজেই তার থেকে বীজ নিয়ে কৃষক এর উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে না, পরের ফসলের জন্য আবার নতুন করে কোম্পানি থেকে বীজ কিনতে হয়। এতে কোমপানি লাভবান হয় বটে, কিন্তু কৃষক দারুণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তার বীজের জন্য। এ কারণেই টার্মিনেটর বা সংহারকারী– এই নামে কুখ্যাতি পেয়েছে এ বীজ। কিন্তু জেনেটিক পরিবর্তনের সুফলগুলো বজায় রেখেও টার্মিনেটর না হবার সুযোগ রয়েছে যদি আমরা এপোমিক্সিস পদ্ধতি অনুসরণ করি। প্রকৃতিতেই অনেকগুলো উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলো বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে, কিন্তু অযৌন প্রক্রিয়ায়। ব্ল্যাক বেরি, ডাণ্ডালায়ানের মতো সাধারণ উদ্ভিদেই এটি দেখা যায়। যদি এই গুণটি শস্যের মধ্যে আরোপণ সম্ভব হয় তা হলে এক দিকে যেমন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ভাইরাস বা রোগজীবাণু সংক্রমণের প্রবণতা সঞ্চারের সম্ভাবনা কমে যাবে (আলুর কাটিং থেকে অযৌন বিস্তারে যা হয়), অন্য দিকে নতুন ফসল থেকে বীজ নিয়ে বংশবিস্তারে

কোনো বাধাও থাকবে না। এই পদ্ধতিতে একটি উন্নত বীজ সৃষ্টির পেছনে যে দীর্ঘ গবেষণা ও অর্থব্যয় হয় (যেমন টার্মিনেটরের ক্ষেত্রে) তাও হবে না। বহু ধরনের হাইব্রিড সৃষ্টি ও তাদের বাছাইয়ের মাধ্যমে এপোমিক্সিস গুণসম্পন্ন এমন অনেক জাতের বীজ সম্প্রসারণ সম্ভব হবে যার এক-একটি এক-এক ধরনের পরিবেশ ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখবে।

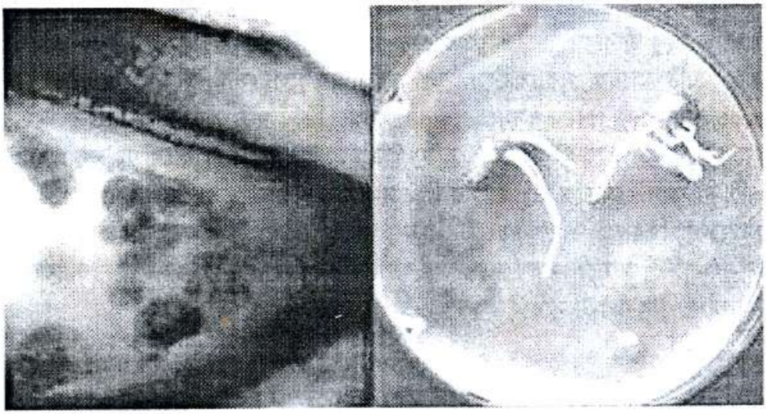

জিন-জরিপ কি আদৌ দরকারি

জীবের জিন-জরিপ করে মনে করা হয়েছে বিরাট কাজ হল– এতেই সব সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু যে বিশাল সময়ে ও ব্যয়সাপেক্ষ প্রক্রিয়ায় এটি করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কাজটি কি আদৌ এমন জরুরি? একটি উপমা দিয়ে বোঝানো যাক। পিয়ানোতে ৮৮টি চাবি রয়েছে। এই চাবিগুলোর সম্পর্কে জানলে কি তেমন কিছু জানা হল? প্রত্যেকটি চাবি কীরকম সুরে বাজে তা জানা হল। কিন্তু তাই বলে বিটাফোনের সিম্ফনি কেমন করে পিয়ানোতে সৃষ্টি হয় সেটি জানতে এ জ্ঞান কোনো কাজেই লাগে না। ঐ ৮৮টি চাবি দিয়ে বিটাফোনের সঙ্গীত-মূর্ছনা যেমন তোলা যায়, তেমনি ব্রাহম কিংবা মোৎসার্টের সঙ্গীতও তোলা যায়– কোনটি কেমন করে এতে তাও কিছুই জানা হল না। আসলে রহস্যটা চাবির মধ্যে নয়, বরং বিভিন্ন চাবির আঘাতের বিভিন্ন সমাহারে, পরম্পরতায়, স্থায়িত্বে এবং তীব্রতায়। জিনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই। ডিএনএ-র বিন্যাস জানলেই তার মাধ্যমে জেনেটিক রহস্যের গোড়ায় পৌছানো সম্ভব নয়। এই বিন্যাসের মধ্যে রহস্যের চাবিকাঠি খোঁজা অনেকটা সেই মাতালটির মতো যে রাতে রাস্তার আলোর নিচে ফুটপাথে অনেকক্ষণ ধরে তার গাড়ির হারানো চাবি খুঁজছে। একজন পথচারী যখন জিজ্ঞেস

করল– তুমি কি নিশ্চিত যে, চাবি এখানেই হারিয়েছ। তখন মাতাল বলল, না, চাবিটা আরো সামনে কোথাও ফেলেছি তবে সেখানে আঁধার বলে খুঁজতে পারি নি। জেফারসনের মত বিজ্ঞানীরা মনে করেন আমরা এখন ডিএনএ-বিন্যাসের কাজ করছি তার কারণ এ কাজটি আমরা করতে পারি, আমাদের আরাধ্য বস্তু এর দ্বারা পাব বলে নয়।

তবে এর মানে এই নয় যে, জিন-বিন্যাস সম্পর্কিত জ্ঞানগুলো কোনো কাজে আসবে না। যেমন ধান, ভুট্টা ইত্যাদি ফসলের জিন-বিন্যাসের জ্ঞানটিকে অবশ্যই কাজে লাগানো সম্ভব হবে। কিন্তু যে বিপুল পরিমাণ জনবল ও অর্থ ব্যয় করে কাজটি করা হয়েছে তাতে আরো সম্ভাবনাময় অনেক কাজ অবহেলিত হয়েছে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। আমেরিকান ভুট্টার একটি জ্ঞাতি ভাই হল টেওমিণ্ট। শেষের জিনিসটা কিন্তু একেবারেই ছোট দড়ির মতো আগাছা বই নয়। দীর্ঘ পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য গবেষণায় এই দুইয়ের জিন-বিন্যাস উদ্‌ঘাটন করে দেখা গেছে দুটার ক্ষেত্রে বিন্যাস হুবহু এক। কার্যত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। সেই পার্থক্যটি আসে বিন্যাস থেকে নয়– বিভিন্ন জিনের আত্মপ্রকাশের ভিন্নতায়, অর্থাৎ এক জিন কী করে আর এক জিনকে নিয়ন্ত্রণ করে সেইখানে। জিনের বিন্যাস থেকে সেটি জানার উপায় নেই।

জিন-বিন্যাস না জেনেই উপকারী জিএম খাদ্য

ট্রান্সজেনোমিক্স নামের পদ্ধতিতে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় জিএম খাদ্য উন্নয়ন করা যেতে পারে। ধরা যাক আমরা এমন একটি ধান উদ্ভাবন করতে চাই যার পাতা সরু না হয়ে বেশ চওড়া হবে। এশিয়ার দেশগুলোতে যে ধরনের ধান তার প্রজাতি ওরাইজা স্যাটাইভা। এর পাতা অপেক্ষাকৃত সরু। কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে বেশি চাষ হয় অন্য একটি প্রজাতি ওরাইজা গ্লাবেরিমা। চওড়া পাতার একটি সুবিধা হল এটি এর ছায়ার কারণে আগাছাকে বাড়তে দেয় না। অথচ পশ্চিম আফ্রিকায়ও মানুষ খেতে পছন্দ করে এশিয়ান ধানকেই– যদিও আগাছার উৎপাতে এই সরু পাতার ধানচাষ করাটি অসুবিধা। ট্রান্সজেনোমিক্স পদ্ধতিতে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব। এই নতুন পদ্ধতিতে জিন-বিন্যাসের চেয়ে জিনের প্রকাশের উপরেই জোর দেয়া হয় বেশি। অন্য প্রজাতি থেকে আরাধ্য জিন ঢোকানোর বদলে এতে মূল প্রজাতিতে বিভিন্ন জিনের প্রকাশের প্যাটার্নটিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়।

তারপর ধরা যাক উদ্ভিদ যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন সার পাচ্ছে কি না এটি বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে কৃষক নিজেই যেন নির্ণয় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা যায়। এমনকি কোন সময়ে তার ফসলের কোন বিশেষ জিনকে কীভাবে কৃষক নিজেই সক্রিয় করে দিতে পারে বা বন্ধ করে দিতে পারে বা বন্ধ করে দিতে পারে– সে পদ্ধতিও বের করা সম্ভব। অতি সাধারণ নির্দোষ কিছু রাসায়নিক পদার্থ মাঠে প্রয়োগ করেই তা করা যেতে পারে।

আমাদের পরবর্তী সবুজ বিপ্লব

যুগে যুগে মানুষের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল অন্নের সংস্থান। এখনো বিশ্বের একটি বড় অংশের জন্য এটিই প্রধান চিন্তা ও আগামী দিনের উদ্বেগ। এখানে মানুষ বাড়ছে, কিন্ত জমি বাড়ছে না। অতীতেও না খেয়ে মরার দু:স্বপ্ন মানুষকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু এনিয়ে অতীতের অনেক ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়নি, মানুষ কোন না কোন ভাবে নিজের প্রয়োজনীয় অন্নের যোগাড় বাড়াতে পেরেছে। এতে যাদুর মত কাজ করেছে কিছু প্রযুক্তি। সেই প্রযুক্তি যা পেরেছে তা করেছে। কিন্তু আজ ভবিষ্যতের অন্ন সংস্থানের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলো আর একবার। একবিংশ শতাব্দীতে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির এই নূতন প্রয়োজনকে মেটাতে এগিয়ে আসবে কোন প্রযুক্তি? বিশেষ করে দুনিয়ার জনবহুল দেশগুলোর জন্য এটি একটি বড় প্রশ্নই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিকট অতীতে কি কি ঘটেছে

গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে আজ অবধি অল্প কিছু সময় বাদে প্রায় পুরোটা সময় খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বেড়েছে। এতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবদানটিও যথেষ্ট বড় ছিল, আর তার মূলে ছিল তথাকথিত সবুজ বিপ্লব। উচ্চ ফলনশীল জাতের উদ্ভাবন, সেচের উন্নয়ন, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার এই সময়ের শুরুতে উৎপাদন বার্ষিক প্রায় ২.৪২% হারে বাড়িয়ে গেছে। আফ্রিকার দেশগুলো বাদ দিলে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্বত্র এ সময় হেক্টর প্রতি শস্য উৎপাদন হার প্রায় দ্বিগুণে পরিণত হয়।

কিন্তু ধীরে ধীরে এই উচ্চ উৎপাদনশীলতা প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ হচ্ছে। ১৯৮৭ থেকে ২০০১ সনের মধ্যবর্তী সময়ে উৎপাদন হার কমে এসেছে। এদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে তেমন কমতি হয়নি। মানুষ ক্রমে বেশি বেশি করে অনাবাদী জমিকে চাষের মধ্যে এনেছে-ফলে বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে চাষ করা যাবে এমন নূতন জমি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

বর্তমান প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে ল্যাবরেটরী খামারে সর্বোচ্চ যে উৎপাদন দিতে পারে প্রায় ততটাই উৎপাদনশীলতা এখন কৃষকের চাষের ক্ষেত্রেও পাওয়া যাচ্ছে। এ প্রযুক্তিকে আরো ভালভাবে গ্রহণ করে খাদ্যের ফলন আরো বাড়াতে পারবে তার সম্ভাবনা কম। এ সুযোগ প্রযুক্তি গ্রহণে গড়িমসি করেছে এমন কৃষকের সংখ্যাও এখন কার্যত খুব বেশি নেই। উদাহরণ স্বরূপ চীনের শতকরা একশ'ভাগ কৃষক এখন উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল ফলায়। বাংলাদেশে ও দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশে এই হার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ পৌঁছে গেছে। কাজেই এখন যে প্রযুক্তি রয়েছে তার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে যে ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানো যাবে সেটি আর মনে হচ্ছে না।

অন্যদিকে সবুজ বিপ্লবের পারিবেশিক প্রতিক্রিয়ায় বর্তমান কৃষি পদ্ধতির টেকসই হওয়ার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যেভাবে, যে হারে উন্নতি নিকট অতীতে হয়েছে সেটিই ধরে রাখা যাবে কিনা সন্দেহ। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের মতে (ইরি) পানি-সম্পৃক্ত ভূমিতে নাইট্রোজেনের ক্রম-অভাব দেখা দেয়। অধিক নাইট্রোজেন ব্যবহারের ফলে ফসলের রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ে, একই ফসল ক্রমাগত চাষ করতে থাকাতেও ভূমির উর্বরতার অবক্ষয় ঘটে। এভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ধান ও গম চাষের অঞ্চলে জমিতে জৈব উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। কীট আর কীটনাশকের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন অস্ত্র-যুদ্ধে এক পক্ষ নূতন কোন কৌশল নিলতো অন্য পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিরোধক তৈরি করছে। এর ফলে বর্তমান প্রযুক্তির ধার ক্রমেই ভোতা হয়ে পড়ছে। অধিক ফলন, ও ঘন ঘন ফলন প্রকারান্তরে কীটদের বংশবৃদ্ধিকেই সুবিধা করে দিয়েছে। একদিকে কীটনাশক, অন্যদিকে কীট-প্রতিরোধী জাতের ফসল চাষ-একে খানিকটা মোকাবেলা করেছে বটে, কিন্তু এর ফলে অভাবিত কতগুলো নূতন উপসর্গ সৃষ্টি হয়েছে। একই কীটনাশক কীটকে ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে কীটের প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য পোকামাকড়কেও ধ্বংস করেছে। জীব-বিবর্তনের নিয়মে নূতন প্রজন্মের কীটেরা ঐসব কীটনাশক ও প্রতিরোধীজাতের বিরুদ্ধ-গুণ নিয়ে জন্মাচ্ছে। তা ছাড়া কীটনাশকের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণে ব্যাপক স্বাস্থ্যহানি প্রকারান্তরে কৃষিরই ক্ষতি করছে। সবুজ বিপ্লবের অগ্রযাত্রা আর একটি ধাক্কা খেয়েছে পানি সংকটের ফলে। চাষের জমিতে পানি

সরবরাহের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো অভাবনীয় পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে। ভারতের ঐ সেচ খাতে বিনিয়োগ অন্য যে কোন খাতের থেকে বেশি। চীনে কৃষি গবেষণা খাতে যত ব্যয় হয়, সেচ খাতে ব্যয় হয় তার দশগুণ। কিন্তু দুনিয়ার দেশে দেশে এখন পানি একটি স্বল্প-প্রাপ্ত জিনিসে পরিণত হচ্ছে। পানির এই সংকট এখন উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। উন্নয়নের ফলে পানির উপর দাবীদারও বাড়ছে। নগর উন্নয়ন ও শিল্প প্রসারের ফলে সেখানেও প্রচুর পানি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এগুবার পথে বাধাগুলো কোথায়?

সবুজ বিপ্লব যা করতে পারত তা করেছে। এর কাজ ছিল প্রধানত যেখানে বৃষ্টি আছে, সেচের পানি দেয়া সম্ভব, জমি চাষের উপযুক্ত সেখানে অধিক ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করে দেয়া। এখন সামনে আরো এগুতে হলে ঢালাওভাবে এরকম অনুকূল পরিস্থিতিতে কার্যকর হয়ে শুধু লাভ নেই। এখন যেখানে আরো সম্প্রসারণ সম্ভব সেখানে এক এক ক্ষেত্রে এক এক ধরনের সমস্যা অপেক্ষা করছে তার জন্য প্রয়োজন হবে আলাদা আলাদা নতুন প্রযুক্তির। এক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাবে অনেকখানি। পুরনো ধাঁচের উচ্চ ফলনশীল ফসলের আরো বিস্তার ঘটিয়ে খাদ্য উৎপাদন বড়জোর আর ২০% বাড়ানো যাবে, তার বেশি নয়। আরো বেশি কিছু করতে হলে শুধু অনুকূল জায়গার কৃষি নয়, আধা-অনুকূল এবং প্রতিকূল জায়গাগুলোর দিকে এবার নজর দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিম আফ্রিকায় অনেক প্রতিকূল অঞ্চল রয়েছে যেখানে জলকষ্ট ও আগাছার উপদ্রব চাষের বড় অন্তরায়। এখানকার উপযুক্ত করে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের উপর ইতোমধ্যে গবেষণা বেশ সফল হয়েছে। এখানকার অনেক মাটিতে লোহা আর দস্তার পরিমাণ খুবই কম-অথচ ফসলের জন্য এসব খনিজ থাকা প্রয়োজন। এজন্য নূতন ধানের জাত উদ্ভাবিত হচ্ছে যা এরকম জমিতে চাষ করা যাবে অথচ যার মধ্যে লোহা ও দস্তা এত ভাল পরিমাণে থাকবে যে এটি খেয়ে অপুষ্টির কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

জিন কারিগরি ও
অন্যান্য নতুন ধারার প্রযুক্তি

ভবিষ্যতে অধিক খাদ্য ফলাবার কাজে জিন প্রযুক্তি যে একটি বড় ভূমিকা পালন করার কথা। বর্তমানে প্রযুক্তিগত সাফল্য যথেষ্ট হলেও গ্রহণযোগ্যতার অভাবে

এটি কিছুটা কমে রয়েছে। জিএম খাদ্য অর্থাৎ জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্য সম্পর্কে এখনো বহু দেশে দ্বিধা থাকা ও এ সম্পর্কিত বিধিনিষেধের কারণে ব্যাপকভাবে এর সম্ভাবনা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এর মধ্যে কিছু কিছু জিএম ফসল কোন কোন দেশে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। জিন-পরিবর্তিত সয়াবিন, বিটি কটন (সংক্ষেপে বিটি নামের ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধী হিসেবে পরিবর্তিত), বিটি ভুট্টা ইত্যাদি প্রচুর উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাপকভাবে ব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। যুক্তরাষ্ট্রও প্রচুর জিএম ফসল ব্যবহার করছে। আসলে এ পর্যন্ত মোটামুটি উন্নত দেশের সমস্যাগুলো জিএম ফসলের গবেষণায় গুরুত্ব পাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী, আগাছা-নাশক প্রতিরোধ করে ফসলকে গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য। দু'একটি বাদে অধিকাংশ সাফল্য এসেছে বড় প্রাইভেট কোম্পানীর গবেষণার মাধ্যমে। এ গবেষণা ও ব্যবসার সিংহভাগ ধরা রয়েছে একা যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানীর হাতে। স্বাভাবিকভাবে এসব ক্ষেত্রে উন্নত বীজ বিক্রয়, আগাছা-নাশক বিক্রয় ইত্যাদি ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিই সব কিছুর পেছনে কাজ করছে।

সে সব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জি এম ফসল থেকে চাষীরা প্রচুর সুবিধা পেয়েছে। ফলন বেড়েছে, রাসায়নিক কীটনাশকের প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে, আগাছা নাশক যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। তবে জিএম খাদ্যের প্রতি সন্দেহ ও ভীতি থাকায় উন্নয়নগুলো তুলা ইত্যাদি অখাদ্য ফসলেই দেখা গিয়েছে বেশি। যেখানে প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি - সেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, তাদের উপযুক্ত বিষয় নিয়ে কাজ এ ক্ষেত্রে খুব একটা হচ্ছে না। এখানে একটি ব্যতিক্রম হলো চীন। সেখানে জিএম ধান, আলু, ভুট্টা ও বাদামের উপর চমৎকার গবেষণা হচ্ছে। চীনের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বেশ কিছু বৈচিত্রও রয়েছে। উন্নত-পুষ্টিযুক্ত ধান, অধিকদিন সংরক্ষণ করা যায় এমন টম্যাটো– এমনিতরো গুণাগুণও সেখানে জিন কারিগরি গবেষণায় গুরুত্ব পাচ্ছে।

জিন কারিগরির সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধারার আরো কিছু প্রযুক্তি উঠে আসছে যা ভবিষ্যতে অধিক খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এরমধ্যে রয়েছে শস্য কাটার পর এর উন্নত প্রসেসিং, কর্ষণবিহীন চাষ, সমন্বিত কীট দমন প্রক্রিয়া ইত্যাদি। উদাহরণ স্বরূপ কর্ষণবিহীন শস্য চাষে ৫০% ভাগ শ্রম বিনিয়োগ বাঁচে, রাসায়নিক কীট নাশক অনেক কম লাগে– যা লাগে তার বিষময়তাও কম হয়, ট্রাক্টরের জ্বালানি, হাল-বলদের ঝকমারিও থাকে না। আরো বড় কথা হলো এতে ভূমির ক্ষয় হবার সম্ভাবনা লোপ পায়। অতীতে সবুজ বিপ্লবে উচ্চ ফলনশীলতা এসেছে পরিবেশের অবক্ষয়ের বিনিময়ে– কারণ একটানা বার-বার

একই ফসল জমির টেকসই হবার গুণকে নষ্ট করে ফেলেছে। এখন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসল চাষ করেও উচ্চ ফলনশীলতা বজায় রাখা কিভাবে যায় সে চেষ্টাই হবে।

চীনের অভিজ্ঞতা

ফসল উৎপাদন ক্ষেত্রে নূতন যুগের সূচনার জন্য যে ক'টি দেশে ব্যাপক গবেষণা চলছে তার মধ্যে চীন অন্যতম। প্রাইভেট কোম্পানীর ব্যবসা সাফল্য বড় লক্ষ্য নয় বলে সেখানে গবেষণার প্রকৃতিটিও কিছুটা ভিন্ন। কীট প্রতিরোধী করে তোলার চেষ্টা সেখানেও রয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা আরো চেষ্টা করছেন কি করে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসলকে আরো উচ্চ ফলনশীল করা যায়। কম সার বা পানি প্রয়োগে এর উচ্চ ফলনশীলতা বজায় রাখা যায়, বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলায়ও যেন এগুলো অক্ষম হয়। জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে ধানের তিনটি প্রধান শত্রু-মাজরা পোকা, গলমাছি, এবং পাতা পোড়া রোগের প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন ইতোমধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সৃষ্টি সেখানে করেছে।

শুধু জিন প্রযুক্তিই নয়, প্রতিকুল অবস্থায় ফসলের আবাদের সুবিধার্থে অন্যান্য নানা দিকেও গবেষণা চলছে। পানির সংকট অধিকাংশ প্রতিকূল জায়গাতে বড় সমস্যা হওয়াতে বিশেষ ধরনের প্লাষ্টিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে এবং সেচের অভিনব পানি-সাশ্রয়ী উপায়কে বাস্তবসম্মত করে তোলা হচ্ছে। কৃষিকে আরো সূক্ষ্ম, আরো নিশ্চিত করে তোলার মাধ্যমে আরাধ্য ফলনশীলতা পাওয়ার কাজও এগিয়ে যাচ্ছে। সহজলভ্য ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহারের উপরও ভরসা করা হচ্ছে অনেকখানি। যেমন কৃষক এখন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে নিজেই বুঝে ফেলবে মাটিতে এ সময় কোন উপাদানটির অভাব রয়েছে-সে হিসাবে সূক্ষ্ম পরিমাপে সার ইত্যাদি এখন প্রয়োগ করা যাবে। কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষকের আওতায় নিয়ে গিয়ে কৃষির দক্ষতা অনেকখানি যাতে বাড়ানো যায় গবেষণা এখন তারই আয়োজন করছে।

অন্য এক সবুজ বিপ্লব

আশাবাদী বিজ্ঞানীরা এখন নূতন একটি সবুজ বিপ্লবের আগমন বার্তা ঘোষণা করছেন। অতীতের বিপ্লবের দোষত্রুটিগুলো এই নূতন ধারা থেকে বাদ পড়বে। অন্য দিকে এটি কোন বিশেষ প্রযুক্তির উপর এককভাবে নির্ভর করবেনা। এর নীতি হবে যেখানে যা প্রয়োজন সেভাবেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার। জিন-প্রযুক্তি অবশ্যই এর থেকে বাদ যাবেনা- বরং এর বিচিত্র সম্ভাবনায় তা পুষ্পিত হবে।

তেমনি তুলনামূলকভাবে সনাতন কৌশলগুলোও অবহেলিত হবেনা- কারণ সুস্পষ্ট সমস্যা সমাধানে এদের মধ্যেও রয়ে গেছে প্রচুর সম্ভাবনা।

সবচেয়ে বড় কথা হলো এই নূতন সবুজ বিপ্লবের জন্য দুনিয়াজোড়া বিশাল ও বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর উপর অতিনির্ভরশীলতা বাদ দিয়ে নিজ দেশে নিজ প্রয়োজনে বিশিষ্ট গবেষণা-উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। এদিক থেকে চীন যথেষ্ট পথ দেখাচ্ছে। এটি সুস্পষ্ট যে আগামী দিনের কৃষি চাহিদার মোকাবেলা করতে হলে সব চেয়ে অধিক বিনিয়োগ করতে হবে এই উন্নয়ন-গবেষণায় এবং কৃষকদেরকে শিক্ষিত ও প্রযুক্তি গ্রহণে সক্ষম করে তোলার জন্য।

গ্যালিলিওর মেয়ে

১৭৩৭ সালের ১২ মার্চ ফ্লোরেন্সে সান্টা ক্রোচে ফ্রানসিস্কান চার্চের সংলগ্ন ছোট একটি কামরায় মিলিত হয়েছিলেন কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী মানুষ। তাঁদের উদ্দেশ্যটি ছিল ব্যতিক্রমী ধরনের। এইখানে এই কক্ষের মধ্যে অচিহ্নিত অবস্থায় নাম-পরিচয়হীন একটি কবরে প্রায় শত বর্ষ ধরে শায়িত ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলাই– খুব কম লোকেই তার খবর জানত। যেহেতু তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদের কারণে তিনি তাঁর কালের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ধিকৃত

ছিলেন, মৃত্যুতেও ওরা তাঁকে ক্ষমা করে নি। যার ফলে তাঁর ঐ রকম অচিহ্নিত কবর। একশ' বছর পর এই গুণমুগ্ধ ভক্তরা বিষয়টি সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন একটি মূল্যবান মার্বেলসমাধির ভেতর তাঁর দেহাবশেষকে পুনস্থাপন করার উদ্যোগ নিয়ে। এই উদ্দেশ্যে কবর খুঁড়ে মশালের আলোকে কফিনের পাশের ইটগুলো সরালে তাঁরা অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখলেন সেখানে কবর একটি নয়– পাশাপাশি পাওয়া গেল গ্যালেলিও ও তাঁর কন্যার সমাহিত কঙ্কাল।

গ্যালিলিওর এই মেয়ের নাম ভার্জিনিয়া। তিনি আজীবন খ্রিস্টান মঠের সন্ন্যাসিনী হিসাবে মারিয়া সেলেস্টে এ নামেই পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে গ্যালিলিওর বিশ্বস্ত ভক্ত ছাত্র ভিনচেনজিও ভিভিয়ানি তাঁকে বাবার পাশে কবর দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন– কারণ তিনি জানতেন বাবা আর মেয়ের মধ্যে গভীর বন্ধনের কথা।

অথচ আজও খুব কম মানুষই জানে যে, গ্যালিলিওর একটি মেয়ে ছিল। আসলে গ্যালিলিও-কন্যা সম্পর্কে নতুনভাবে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে সম্প্রতি প্রায় তিন বছরের একটি গবেষণাকর্মের ফলে। বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক ও লেখক ডাভা সোবেল বিভিন্ন দলিলপত্র ঘেটে এ কাজটি করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান দলিল যা রয়েছে তা হল বাবাকে লেখা মারিয়ার ১২০টি চিঠি। এটি শুধু তাঁর সম্বন্ধে বা বাবা-মেয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্যই উদ্‌ঘাটন করে নি, খোদ গ্যালিলিওর জীবন সম্পর্কে, এমনকি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ-কাহিনী সম্পর্কে নতুন আলোকসম্পাত হয়েছে।

মারিয়া সেলেস্টের জন্ম ১৩ আগস্ট ১৬০০ সালে ইতালির পাদুয়াতে, যেখানে গ্যালিলিও তখন অধ্যাপনা করছিলেন। তাঁর মা মারিনা গাম্বা গ্যালিলিওর বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু দীর্ঘ বারো বছর তাঁরা একত্র বাস করেছেন। মারিনার গর্ভে গ্যালিলিওর আরও দুটি সন্তান ছিল– আরও এক মেয়ে ও এক ছেলে। সামাজিক সমালোচনার কারণে মেয়ে দু'জনের বয়স যখন ১৩ আর ১২, গ্যালিলিও তাঁদেরকে সন্ন্যাসিনী হিসেবে কনভেণ্টে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন– সেই থেকে আজীবন তাঁরা সন্ন্যাসিনী হিসেবেই পরিচিত থেকেছেন, পিতৃ-মাতৃ পরিচয়ে নয়। তবে বড় মেয়ে মারিয়ার সঙ্গে গ্যালিলিওর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল– তাঁরা সব সময় পত্রবিনিময় করতেন আর শেষ অবধি মেয়ে হয়ে উঠেছিল বাবার প্রধান সহকারী ও সবচেয়ে আপনজন। বিশ বছর ধরে এই ভূমিকা পালন করলেও মারিয়া কিন্তু কনভেন্ট থেকে কখনও বেরিয়ে আসতে পারেন নি। এখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়েছিল।

মেয়ের লেখা যে-১২০টি চিঠি উদ্ধার করা গেছে, সেগুলো গ্যালিলিওর জীবনের নানা অধ্যায়ের এক অমূল্য দলিল। রোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গ্যালিলিওর বিরোধের সূত্রপাত বেশ আগে থেকেই হয়েছে, ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও প্রথম দূরবীক্ষণের কথা জানেন। এই যন্ত্রটিকে তিনি বহু সাধনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন– সেটি হল আকাশ-পর্যবেক্ষণের কাজ। প্রথমেই দূরবীক্ষণের সাহায্যে গ্যালিলিও প্রমাণ করলেন চাঁদের ভূমি পৃথিবীর মতোই পর্বতমালা, উপত্যকা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। পরের বছর ১৬১০ সালের জুন মাসে তিনি এ যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করলেন বৃহস্পতি গ্রহের দুটি উপগ্রহ। তাছাড়া তিনি সৌর কলঙ্কও দেখাতে সক্ষম হলেন যা কিনা এক চান্দ্রমাসে একবার সূর্যের নিজের আবর্তনের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে আবর্তিত হয়।

দীর্ঘ দিন ধরে গ্যালিলিও কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের অনুসারী ছিলেন। তখন দূরবীক্ষণ এ সম্পর্কে প্রচুর নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ তাঁর হাতে এনে দিল। টলেমির মতবাদ অনুসারে সবকিছু যে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না সেটি তো দেখাই যাচ্ছিল। যেমন, বৃহস্পতির উপগ্রহ দুটি বৃহস্পতির চারদিকেই ঘুরছে, পৃথিবীর নয়। গ্যালিলিও জোরেসোরে কপারনিকাসের মতবাদ চারদিকে প্রচার করতে থাকলে একাডেমিক জগতের অনেক হিংসুটে গণ্যমান্যরা তাঁর বিরুদ্ধে তো গেলই, স্বয়ং পোপ পঞ্চম পল এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি ধর্মীয় জ্ঞানী ব্যক্তি বলে সুপরিচিত কার্ডিনাল বেলারমিনোর সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করলেন। দীর্ঘদিন আগে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে– এমন কথা প্রচারের অপরাধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ এনে যারা জিয়োর্দানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল তাদের মধ্যে বেলারমিনোও ছিলেন। গ্যালিলিওর ভাগ্য ভালো যে, তাঁকে পুড়িয়ে মারা হল না, তবে চুপ করিয়ে দেয়া হল।

বছর সাতেক পর গ্যালিলিওর জন্য অবস্থার একটু উন্নতি হল– কারণ নতুন পোপ অষ্টম উরবান ক্ষমতা নিলেন। উদারচেতা এই পোপ কিন্তু গ্যালিলিওকে ভালো চোখে দেখতেন। কাজেই গ্যালিলিও তাঁর কাছ থেকে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য গবেষণার অনুমতি চেয়ে পেয়ে গেলেন। কাজটা তিনি শুরু করলেন সুকৌশলে "বিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি প্রধান মতবাদ নিয়ে কথোপকথন" এই শিরোনামে একটি কাল্পনিক আলাপের আকারে বই প্রকাশ করে। এতে একজন কোপারনিকাসের মতবাদের, একজন টলেমির মতবাদের অনুসারীর তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তিগুলো আনা হল। আর একটি চরিত্র রইল– একজন শিক্ষিত সাধারণ মানুষ হিসাবে। এভাবে গ্যালিলিও তাঁর বক্তব্যগুলো অন্যের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিজেকে নিরাপত্তা দেবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু বইটি প্রকাশিত হতে কিছুটা বিলম্ব হল নানা সমকালীন ঘটনাচক্রে। আর এই বিলম্বই শেষ পর্যন্ত গ্যালিলিওর কাল হল। ও সময় ইতালিতে প্লেগ রোগ ভয়াবহ মহামারী হিসাবে দেখা দিয়েছিল। ফলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভ্রমণের উপর নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল– দু'দিনের পথে এজন্য এক সপ্তাও লেগে যেত। এর মধ্যে আবার গ্যালিলিওর প্রকাশক, দুনিয়ার প্রথম বৈজ্ঞানিক সোসাইটি লিনসিয়ান সোসাইটির স্থাপনকর্তা প্রিন্স সেসি গুরুতর অসুস্থ হয়ে হঠাৎ মারা গেলেন। এ সবের ফলে 'কথোপকথন' বইটি শেষ পর্যন্ত যখন প্রকাশিত হল এর মধ্যে রোমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়ে গেছে। এই

প্রকাশনার জন্য গ্যালিলিওকে আবার ধর্মীয় বিচারের সম্মুখীন হতে হল ১৬৩৩ সালের বসন্তে। ইতোমধ্যে গ্যালিলিওর প্রতি পূর্বে সদয় পোপ উরবান ত্রিশ বর্ষ যুদ্ধের খেসারত দিতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পক্ষে আর গ্যালিলিওর প্রতি সহানুভূতি দেখানো সম্ভব ছিল না, এই বিদ্রোহী জ্যোতির্বিদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য অনেকেই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল।

গ্যালিলিও-কন্যা মারিয়া সেলেস্টের চিঠিগুলোতে নানাভাবে এসব ঘটনার কথা এসেছে। অবশ্য চিঠির অনেকটাই কনভেন্টের মহিলাদের মধ্যে নানা গুজবের কথাও প্রাধান্য পেয়েছে। গ্যালেলিওর কারাবাসের হুকুম হল— এবং সেই থেকে তাঁর জীবনে অপমানজনক এই অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। এ সময় মারিয়া বাবার সহায়ক হবার জন্য নানা চেষ্টা করেছেন। যেমন শাস্তির অংশ হিসাবে গ্যালিলিওকে ক্ষমাপ্রার্থনার বাইবেল-বাক্যসমূহ আবৃত্তি করতে হয়েছে তিন বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে। মারিয়া ১৬৩৩ সালের আক্টোবরে বাবার কাছে এই কাজটি তাঁর পক্ষ থেকে নিজে করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "তোমার শাস্তির অন্যান্য দিকও যদি আমি নিজে পালন করে তোমাকে অব্যাহতি দেওয়াতে পারতাম, তা হলে আমার বর্তমান কারাগারের চেয়ে (কনভেন্ট) আরো ভয়ানক কারাগারে যেতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকত না"।

গ্যালিলিও এসব চিঠির জবাবে মারিয়াকে কী লিখতেন তা জানার সুযোগ কখনও হয় নি। কারণ মারিয়া যখন মারা যান তখন কনভেন্টের প্রধান মাদার আবেস তাঁর কক্ষে গ্যালিলিও-লেখা চিঠির একটি বড় বাণ্ডিল আবিষ্কার করেছিলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলো পুড়িয়ে নষ্ট করার উদ্যোগ নিয়েছেন। হাজার হলেও একজন নিষ্ঠাবতী ক্যাথলিক কিছুতেই এই রকম একজন নিন্দিত ধর্মবিরোধীর লেখা নিজের কাছে রাখতে পারেন না।

লেখক মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে এবং বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ১৯৬০ সালে তিনি এদেশের প্রথম জনপ্রিয় বিজ্ঞান মাসিক *সাময়িকীর* প্রতিষ্ঠা করেন এর সম্পাদক হিসাবে। তাঁর সম্পাদনায় এ পত্রিকা এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞান সাময়িকী সহ বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে, এবং তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যাও অনেক। নিজের বিষয় পদার্থবিদ্যার বাইরেও বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখায় তাঁর লেখনীর স্বচ্ছন্দ গতি রয়েছে। বর্তমান বইটিও তার সাক্ষ্য বহন করে। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে লেখালেখি ছাড়াও টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অবদান রেখে চলেছেন। দেশের একজন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। ১৯৭৮ সালে অনুরূপ উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস) নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, নিজে কর্ণধার থেকে যাকে তিনি দেশব্যাপী মাঠপর্যায়ে কাজের একটি বড় ও সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।

প্রচ্ছদ : উত্তম সেন

ISBN 984410505-6
9 799844 105057